

বেঙ্গল টাইমস
সময়ের থেকে এগিয়ে।

শ্রীরদ সংখ্যা ২০২৬



bengaltimes.in



ISSN: 2445 5657

সূচিপত্র

শারদ সংখ্যা ২০২৬

শ্রদ্ধার্থ্য

তারে জমিন পর

□ অরিন্দম সরকার

বিশেষ রচনা

পায়ে পড়ি বাঘমামা

□ সৌম্যজিৎ চৌধুরি

আপনার হাতে রইল শুধুই ডিম,

ঘোড়ার ডিম

□ স্বরূপ গোস্বামী

সিবিআই যদি ম্যাচরিপোর্ট পড়ত!

□ হরিশ মুখার্জি

বাড়িতে একটাও পুজো সংখ্যা

নেই!

□ অরিত্র দাস



রাজনীতি

তিনিই মধ্যম, যিনি চলেন তফাতে

□ অজয় কুমার

একা কুণাল রক্ষা করেন...

□ সরল বিশ্বাস

বিনোদন

প্রকাণ্ড ছায়ার আড়ালে

□ অমিত ভট্টাচার্য

কবিতা বেঁচে থাকুক গান হয়ে

□ বৃষ্টি চৌধুরি

সেই তো থিলার আর ভূত

❑ মলয় সেন

‘প্রচলিত’ গানের আড়ালে

❑ মুকেশ সিংহ

গল্প

গানের ওপারে

❑ সৃজন শীল

নতুন অঙ্কের খোঁজে

❑ ত্রিদিব দেবনাথ

ফেরার টিকিট

❑ সুপ্রিয় চক্রবর্তী

খেলা

যথার্থই অলরাউন্ডার

❑ ধীমান সাহা

বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!

❑ দেবায়ন কুণ্ডু

ভ্রমণ

ছোট ছোট পায়ে সেই দুর্গম বজ্রায়

❑ অন্তরা চৌধুরি

হোমস্টে কোথায়, এ তো আস্ত

হোটেল

❑ হেমন্ত রায়

নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা

কাফেরগাঁও

❑ উত্তম জানা

জটায়ু থাকলে নির্ঘাত লিখতেন,

সারাভায় স্যারেভার

❑ কুন্তল আচার্য

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী



১২ বছরে...

বছরটা ২০১৫। মহালয়া পেরিয়ে গেছে। পুজোর তিন-চার দিন আগে হঠাৎ এল প্রস্তাবটা। একটা অনলাইন পুজো সংখ্যা করলে কেমন হয়! সেই রাতেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, একবার ঝুঁকি নিয়েই দেখা যাক। প্রস্তুতি না থাকুক, পাগলামিটা ছিল পুরোদমে। মনে আছে, মাত্র তিনদিনের মাথায় সোয়া একশো পাতার একটা শারদ সংকলন বেরিয়েছিল। বিষয় ধরে ধরে একটার পর একটা লেখা তৈরি হচ্ছে। ই-মেল মারফত পৌঁছে যাচ্ছে বিশেষ ঠিকানায়। দিন-রাত এক করে একের পর এক পাতা তৈরি করে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছিল বন্ধুবর শুভজিৎ বোস। পুজোর ঠির আগের দিন, রাত বারোটায় হয়েছিল আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। কীভাবে মাত্র তিনদিনে পুজো সংখ্যা রাতের আলো দেখেছিল, সে কথা ভাবলে এখনও কেমন রোমাঞ্চ জাগে।

তখনও নিউজ পোর্টাল জিনিসটা ব্যাঙের ছাতার মতো এখানে সেখানে গজিয়ে ওঠেনি। কর্পোরেট সংস্থাগুলিও হামলে পড়েনি। তখনও ডিজিটাল মিডিয়া ‘বঙ্গ জীবনের অঙ্গ’ হয়ে ওঠেনি। বাংলায় তখন হাতে গোনা কয়েকটি নিউজ পোর্টাল। তাদের মধ্যে একেবারে সামনের সারিতেই ছিল বেঙ্গল টাইমস। রাজনীতি, সাহিত্য, সিনেমা,

জেলা, ভ্রমণ, খেলা, স্পেশ্যাল ফিচার— নানা বিভাগের ডালপালা। আগ্রহী পাঠকদেরই কেউ কেউ দিব্যি লেখক হয়ে উঠছেন। ই-মেল উপচে পড়ছে নানা স্বাদের লেখায়। কোনওটা এককথায় অনবদ্য, কোনওটা আবার একটু কাঁচা হাতের, একটু ঘসে মেসে নিতে হচ্ছে। প্রতিদিন আপলোড হয়ে চলেছে একের পর এক ঝাঁঝালো লেখা, আকর্ষণীয় ফিচার। পাঠক মহলে খুব দ্রুতই সাড়া ফেলেছিল সেই নবাগত ওয়েবসাইট।

এই এক দশকে কতকিছু বদলে গেল। আস্ত একটা সরকারই বদলে গেল। কত পোর্টাল, কত ইউটিউব চ্যানেল গজিয়ে উঠল। কত নতুন নতুন পডকাস্ট চ্যানেল। একটু একটু করে ডিজিটাল মিডিয়াই যেন হয়ে উঠল মূলস্রোত। আর মূলস্রোত চ্যানেলের প্রভাব যেন ফিকে হতে লাগল। কাগজ পড়া যেন ‘সেকেলে অভ্যেস’। কত পোর্টাল দারুণভাবে সাড়া জাগিয়েও অকালে হারিয়ে গেল। কত নতুন নতুন ভাবনা। কত নতুন নতুন ছেলেমেয়ে কাজ করছে এই ভারুয়াল মিডিয়ায়। শুধু লেখা নয়, প্রায় সব সাইটই ভিডিও আপলোড করছে। ফেসবুক লাইভ করছে। প্রযুক্তিকে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন চটজলদি ফাস্ট ফুডের আবহে সাবেকি বেঙ্গল টাইমস তো পিছিয়ে পড়বেই। না রয়েছে কর্পোরেট আনুকূল্য, না রয়েছে যথার্থ টিমওয়ার্ক, না রয়েছে ঢাক পেটানোর প্রযুক্তিকে দারুণভাবে ব্যবহার করার মুন্সিয়ানা।

অগত্যা, বেঙ্গল টাইমসের চরিত্রেও কিছু বদল এসেছে। দৈনন্দিন খবরের বদলে বিশ্লেষণ, ফিচারে জোর দেওয়া হয়েছে। রসগোল্লার বদলে সন্দেশ-বরফিতে জোর। যেন তিন-চারদিন পরেও টটকা মনে হয়। অফস্টাম্পের বাইরের অনেক বল ছেড়ে দিতেই হয়। আবার হচ্ছে থাকলেও সময় ও প্রস্তুতির অভাবে অনেক বিষয় ছোঁয়াই যায় না। অনিয়মিত হয়েছে, হোঁচট খেয়েছে। ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। গত এগারো বছরে যেমন নিয়ম করে বেরিয়েছে পূজো সংখ্যা, তেমনই লকডাউনের সময় থেকে প্রতিমাসেই দুটো বা তিনটে ই-ম্যাগাজিন। গত পাঁচ বছরে ই-ম্যাগাজিন ও ই-বুক মিলিয়ে সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই দেড়শো ছাপিয়ে গেছে। সবগুলো যে দারুণ সাড়া ফেলেছে, এমন নয়। তবে, এইসব লেখাই যখন সোশ্যাল সাইটে অন্যদের ওয়ালে হুবহু ঘুরে বেড়াতে দেখি, তখন মনে হয়, লেখাগুলো হারিয়ে যায়নি।

এবার শারদ সংকলন। কিছুটা বিলম্বিত। তবে সেই বিলম্ব কিছুটা ইচ্ছাকৃত। অন্যরা জুলাইয়ে বের করে দিল বলে আমাদের জুন মাসে বের করে দিতে হবে, এমন ছেলেমানুষির প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকাই ভাল। গায়ে পূজোর গন্ধ না থাকলে কীসের পূজো সংখ্যা! প্রস্তুতি ছিল। আবার শেষবেলার তাড়াহুড়োও ছিল। এবার পূজো অনেকটা দেরিতে। তাই ‘হচ্ছে-হবে’

মার্কী আলসেমিও ছিল। তবে এবার একটা পরীক্ষামূলক দিক আছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এআই-কে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে ছবি নির্বাচন, পাতার লে আউটে। এমনকী সুন্দর কভারের ছবিটিও এআই মহাশয়ের বানানো। দু-একটি লেখার ক্ষেত্রেও যন্ত্রের বুদ্ধি আর মানুষের বুদ্ধির মেলবন্ধন আছে। চাইলে কলেবর আরও বাড়ানোই যেত। কিন্তু লোকের পড়ার সময় কই! তাছাড়া, বেশি বড় হলে আপলোড করা, শেয়ার করা, ই মেলে অ্যাটাচ করা-এসব যান্ত্রিক সমস্যা থাকে। পরিসর একটু কম হলে প্রযুক্তিগত সেই সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যায়। তাই সেধুুরি পেরিয়েই ব্যাট তুলে রাখা। তাছাড়া, একগুচ্ছ লেখা জুড়ে দিয়ে পাঠককে বেশি বিড়ম্বনায় না ফেলাই ভাল।

পড়ে ফেলুন। পুজোর পর বেঙ্গল টাইমসকে আরও ঝকঝকে চেহারায়, আরও নতুন আঙ্গিকে হাজির করার প্রতিশ্রুতি রইল। সেইসঙ্গে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ই-ম্যাগাজিনের চেষ্টাও জারি থাকবে।

স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদক

বেঙ্গল টাইমস



অরিন্দম সরকার

প্রিয় নানা,

গত কয়েকদিনে তোমার বেশ কিছু ভিডিও দেখে ফেললাম। ইউটিউবের দৌলতে অন্তত একটা সুবিধা হয়েছে। চাইলেই পুরনো ছবি দেখা যায়। চাইলেই পুরনো কোনও ইন্টারভিউ শোনা যায়। কেউ চলে গেলে তাঁর ফেলে আসা জীবনে আরও বেশি করে উঁকি দিতে ইচ্ছে করে। হয়তো এটাও একধরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তোমার সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। থাকার কথাও নয়। কোনও দিন তোমার সঙ্গে এক কাপ চা খেতে

খেতে গল্প করিনি। কোনও অনুষ্ঠানে তোমাকে সামনে থেকে দেখেছি, এমন স্মৃতিও নেই। অথচ তোমাকে নিয়ে লিখতে বসলে বারবার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলার কথা, বাবার কথা, মায়ের কথা, এমনকী আমার নিজের ছেলেমানুষির কথাও। না থেকেও পরতে পরতে তুমি থেকে গেছ।

আমার বেড়ে ওঠা মফস্বলে। সেই বেড়ে ওঠার দিনগুলোয় অমিতাভ কিছুটা যেন দূরে। ভিডিও হলে রমরম করে চলছে মিঠুন চক্রবর্তীর ডিস্কো ড্যান্সার, ওয়াক্ত কি আওয়াজ, ডান্স ডান্স। কখনও আবার অমিতাভের পুরনো ছবি— দিওয়ার, মর্দ, শোলে। এরই ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি মারেন জিতেন্দ্র, ধর্মেন্দ্রা। নয়ের

দশকে উঠে এলেন তিন খান— আমির, সলমন, শাহরুখ। তারও পরে অক্ষয় কুমার, সুনীলরা শেঠিরা। নায়ক বলতেই কতগুলো চেনা ফর্মুলা ভেসে উঠত। ঢিসুম ঢিসুম মার, নায়িকার কোমর জড়িয়ে নাচ, আরও কত কী। কিন্তু তুমি আমাদের চেনা নায়কের সংজ্ঞাটাই বদলে দিয়েছ। বুঝিয়ে দিয়েছ, নায়ক হওয়ার জন্য সুঠাম শরীর, ঝকঝকে চেহারা কিংবা নায়িকার কোমর জড়িয়ে নাচার প্রয়োজন নেই। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথম প্রথম তোমাকে যে খুব গুরুত্ব দিতাম, তাও নয়। মনে হত, এ নাচতে পারে না, দেখতে সুন্দর নয়। একে দিয়ে বেশিদিন চলবে না।

বাবা খুব একটা সিনেমার পোকা ছিলেন না। কিন্তু ভালো অভিনয় দেখলে তাঁর চোখমুখ বদলে যেত। সিনেমা দেখে ফেরার পথে তিনি চরিত্রগুলো নিয়ে কথা বলতেন। কে ভালো অভিনয় করল, কে শুধু সংলাপ বলল, আর কে চরিত্রটাকে সত্যি করে তুলল—এসব নিয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি, বাবা আসলে অভিনয়ের চেয়ে মানুষকে খুঁজতেন। পর্দায় যে চরিত্রটা দেখছেন, তার মধ্যে কোনও সত্যি আছে কি না, সেটাই ছিল তাঁর কাছে বড় কথা। তোমাকে দেখলে আজও বাবার কথা মনে পড়ে।

ক্রান্তিবীর—এর সেই রাগী মানুষটা যখন

অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, তখন তোমার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করে ঠিকই। কিন্তু তোমার চোখেমুখের সেই যন্ত্রণা, সেই অসহায় রাগের মধ্যে আমি অন্য কিছুও খুঁজে পাই। মনে হয়, এই লোকটা শুধু অভিনয় করছে না। সে আমাদের চেনা পৃথিবীর জমে থাকা ক্ষোভগুলোকে ভাষা দিচ্ছে। ‘পরিন্দা’ ছবিতে তোমার অভিনয়ের মধ্যে যে অন্ধকার, যে হিংস্রতা, যে মানসিক টানাপোড়েন দেখেছি, তা সহজে ভোলা যায় না। ‘প্রহার’—এ তোমার কঠিন মুখের আড়ালে যে শৃঙ্খলা আর যন্ত্রণা ছিল, সেটাও মনে থেকে যায়। আবার ‘অব তক ছপ্পন’—এ তোমার উপস্থিতি একেবারে অন্য রকম। চরিত্রগুলোকে তুমি এমনভাবে জীবন্ত করে তুলতে যে, দর্শক হিসেবে আমরা শুধু তাদের কাজকর্ম দেখি না, তাদের ভিতরের মানুষটাকেও বোঝার চেষ্টা করি। আর ‘ওয়েলকাম’—এর উদয় শেড়ি! সেই রাগী অথচ অদ্ভুত রকমের হাস্যকর মানুষটাকে মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। একই অভিনেতা যে এত সহজে দর্শককে ভয় দেখাতে পারেন, আবার হাসাতে পারেন, সেটা তোমাকে না দেখলে হয়তো এতটা বুঝতাম না।

তোমার অভিনয়ের সবচেয়ে বড় গুণ বোধ হয় এই যে, তুমি কখনও শুধু নায়ক হওয়ার চেষ্টা করেনি। তুমি চরিত্র



হয়ে উঠতে চেয়েছ। চরিত্রটা সুন্দর কি না, তাকে সবাই ভালোবাসবে কি না, সে পর্দায় কতটা আকর্ষণীয় দেখাবে— এসবের চেয়ে তার ভিতরের সত্যিটা তোমার কাছে বেশি জরুরি বলে মনে হয়েছে।

আমাদের চারপাশে অবশ্য তার উল্টো ছবিটাই বেশি দেখি। সবাইকে সুন্দর দেখাতে হবে। সফল দেখাতে হবে। সুখী দেখাতে হবে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না। ব্যর্থতার কথা বলা যাবে না। অথচ জীবন তো এমন নয়। জীবনে ব্যর্থতা আছে, অপমান আছে, ভুল আছে, আবার নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টাও আছে। তোমার চরিত্রগুলো আমাকে সেই অসম্পূর্ণ জীবনটার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আমাদের পাড়ায় একসময় একজন মানুষ ছিলেন। খুব সাধারণ জীবন। সামান্য রোজগার। অথচ পাড়ার কারও বিপদ হলে তিনিই সবার আগে হাজির হতেন। কারও মেয়ের বিয়ে, কারও ছেলের পড়াশোনার খরচ, কারও অসুখবিসুখ—যতটুকু পারতেন সাহায্য করতেন। নিজের বাড়িতে কতটা অভাব, তা নিয়ে কোনও দিন মুখ খুলতেন না। ছোটবেলায় তাঁকে খুব বড় মানুষ বলে মনে হত না। বরং বেশ সাদামাটা, একটু একঘেয়ে ধরনের মানুষ বলেই মনে হত। বড় হয়ে বুঝেছি, লোকটা আসলে কত বড় ছিলেন।

নানা, তোমার গ্রামে ফিরে যাওয়া, কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর কথা যখন পড়ি, তখন সেই মানুষটার কথাই মনে পড়ে। মনে হয়, পর্দার বাইরেও তুমি



আমাদের অজান্তেই বদলে দিয়েছে। আমরা সাহায্যের চেয়ে সাহায্য করার ছবিটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে শিখছি। কিন্তু তোমার সেই স্বপ্নের গ্রামের ছবি! সেখানে কীভাবে তোমার দিন কেটেছে? গুগল বাবাজীবনের কাছে অনেক সার্চ করলেও সে কিন্তু খুব বেশি ছবি দেখাতে পারল না। একটা জিনিসই পরিষ্কার, সেই গ্রামে কাটানোটা তোমার বিপণন কৌশল নয়। অন্য কেউ একদিন গ্রামে কাটালে কয়েক হাজার ছবি, রিলস ঘুরঘুর করত।

এমন একটা জীবন বেছে নিতে চেয়েছ, যেখানে মানুষকে তার প্রয়োজনের সময়ে পাওয়া যায়।

আমাদের সময়টা বড্ড অদ্ভুত। একটা ভালো কাজ করার আগেও এখন আমরা অনেক সময় ভাবি, তার ছবি তোলা যাবে কি না। কোথাও সাহায্য করতে গেলে মনে হয়, সেটা জানানো দরকার। না জানালে মানুষ বুঝবে কী করে যে আমি ভালো কাজ করেছি! সোশ্যাল মিডিয়া খুললে তো এমন ছবিরই ছড়াছড়ি। তারকারা আবার এইসব ছবি তোলানোর জন্য লোক ভাড়া করে সর্বক্ষণ তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন। এই অভ্যাসটা

সেই জায়গায় তোমার জীবনযাপনের কথা আমাকে বিস্মিত করে। এত বড় মাপের মানুষ হয়েও এত সাধারণ থাকা যায়! মুম্বইয়ের ঝলমলে জগৎ ছেড়ে মহারাষ্ট্রের গ্রামের পরিবেশে ফিরে যাওয়া, কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়ানো, নিজের সঞ্চয়ের বড় একটা অংশ মানুষের প্রয়োজনে বিলিয়ে দেওয়া। রিল নয়, তুমি যেন রিয়েল হিরো। তোমার সব কাজের খবর আমার জানা নেই। জানার কথাও নয়। কারণ, তুমি আড়াল রাখতে জানো। তুমি শিখিয়েছো, সব কাজের বিজ্ঞাপন করতে নেই। তোমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গেও আমার পরিচয়

নেই। যেটুকু চিনেছি, তাতে এটুকু বুঝি, তুমি মানুষটা আর দশজনের থেকে আলাদা, একেবারেই আলাদা।

আমিও তো চাকরি করি। মাসের শেষে হিসেব মেলাই। বাড়ির খরচ, ভবিষ্যতের চিন্তা, নানা দায়দায়িত্ব—সব মিলিয়ে নিজের জীবনটাই কখনও কখনও বেশ ভারী হয়ে ওঠে। রাস্তায় কোনও অসহায় মানুষকে দেখলে মন খারাপ হয়। খবরের কাগজে কৃষকের আত্মহত্যার খবর পড়লে বুকের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি তৈরি হয়। কিন্তু পরের দিন আবার নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ি। তোমাকে নিয়ে ভাবলে তাই নিজের কাছেই একটা প্রশ্ন ফিরে আসে—আমি কি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু করছি? খুব বড় কিছু নয়। হয়তো কারও পাশে দাঁড়ানো, কোনও অসহায় ছাত্রের বই কেনার ব্যবস্থা করা, বিপদে পড়া কোনও পরিবারের জন্য কয়েকজনকে একজোট করা। হাসপাতালে গিয়ে কোনও চেনা বা অচেনা মানুষকে রক্ত দেওয়া! পাড়ার কোনও বৃদ্ধ মানুষের কাছে গিয়ে তাঁর গল্প শোনা! কাজগুলো ছোট হতে পারে। কিন্তু একেবারে কিছুই না করার চেয়ে তো ভালো।

মানুষের সাফল্যের হিসেব করতে বসলে আমরা তার পদবি, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্কের টাকা গুনি। কিন্তু সে জীবনে ক’জন

মানুষের কাজে লেগেছে, বিপদের দিনে ক’জন তার নাম মনে করেছে, সেই হিসেবটা করি না। আমার মনে হয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত ওই হিসেবটাই বেশি জরুরি।

তাই তোমাকে নিয়ে আমার মুগ্ধতা তোমার তারকাখ্যাতির জন্য নয়। তুমি কত বড় অভিনেতা, কত পুরস্কার পেয়েছ, কত বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে কাজ করেছ—এসবের বাইরেও তোমার একটা পরিচয় আছে। তুমি এমন একজন মানুষ, যিনি নিজের সাফল্যের মধ্যেও গ্রামের মাটি, সাধারণ মানুষের জীবন আর তাঁদের অভাবের কথা ভুলে যেতে চাননি। তবে তোমাকে দেবতা বানাতে চাই না, নানা। তোমারও নিশ্চয়ই ভুল আছে, রাগ আছে, এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে, যার সঙ্গে সবাই একমত হবেন না। মানুষকে ভালোবাসার জন্য তাকে নিখুঁত হতে হয় না। বরং তার অসম্পূর্ণতার মধ্যেও যে ভালো কিছু বেঁচে থাকে, সেটাকেই চিনতে হয়।

তোমার অভিনয় আমাকে আনন্দ দিয়েছে। তোমার চরিত্রগুলো আমাকে ভাবিয়েছে। কিন্তু তোমার জীবন থেকে যে শিক্ষা নিতে চাই, তা খুব সাধারণ। নিজের চারপাশের মানুষের দিকে একটু বেশি করে তাকানো। নিজের সামর্থ্যের মধ্যে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। সাফল্যকে



এমনভাবে গ্রহণ করা, যাতে তার ভারে মাটির সঙ্গে সম্পর্কটা হারিয়ে না যায়। এই পৃথিবীতে সবাই বড় অভিনেতা হতে পারে না। সবাই বিখ্যাতও হতে পারে না। কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগটা সবারই আছে।

আমার বয়স বিয়াল্লিশ। এই বয়সে এসে আর খুব বেশি বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি না। চাই, জীবনের শেষে ফিরে তাকিয়ে যেন মনে না হয়, শুধু নিজের জন্যই বেঁচে রইলাম। চাই, অন্তত কয়েকজন মানুষ বলতে পারেন, বিপদের সময়ে লোকটা পাশে দাঁড়িয়েছিল। তোমাকে দেখে এই ইচ্ছেটা আরও জোরালো হয়।

তোমার কাছে কখনই কিছু চাওয়ার ছিল না। আজ তো তুমি সব চাওয়া-পাওয়ার

উর্ধ্বে। আপাতত কয়েকদিন তোমাকে নিয়ে বিভিন্ন কাগজে লেখালেখি হবে। অনেক স্মৃতিচারণায় তোমার কথা ফিরে আসবে। তোমার টুকরো টুকরো কথা রিলস হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এটাও জানি, সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে এই চর্চা একসময় হারিয়েও যাবে। আমরা নতুন কিছু নিয়ে, নতুন কাউকে নিয়ে মেতে উঠব। কিন্তু মন থেকে চাই, তোমার চরিত্রগুলো বেঁচে থাক। তোমার ওই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন বেঁচে থাক। রিলস গুলো হয়তো থাকবে না। কিন্তু এখনও সময় পেলেই যেন তোমার ভিডিওগুলো খুঁজে বেড়াই। পরের প্রজন্মের কাছে তোমার জীবনের কাহিনি রূপকথা হয়ে ফিরে আসুক। তারাও জানুক গ্ল্যামার সর্বস্ব দুনিয়ায় এমন একজন তারকা ছিল, যে মাটির কাছাকাছিই থাকত।



সৌম্যজিৎ চৌধুরি

আমার নামটা আপাতত গোপনই থাক। কারণ, নাম জানাজানি হয়ে গেলে সাংবাদিকরা পিছু নেবেন। কেউ জানতে চাইবেন, নতুন পরিবেশ কেমন লাগছে। কেউ জানতে চাইবেন, বক্সার জঙ্গলে পা দিয়েই প্রথম কী খেলাম। কেউ আবার মাইক্রোফোন মুখের সামনে ধরে বলবেন, ‘আপনি কি বক্সায় পর্যটন বাড়াতে এসেছেন?’

আরে বাবা, আমি বাঘ। আমার কি আর কোনও কাজ নেই? পর্যটন বাড়ানো, অর্থনীতি চাঙ্গা করা, হোমস্টের বুকিং বাড়ানো—এসবও কি এখন আমাকে দেখতে হবে?

বিহারের বাম্বিকী অরণ্যে দিব্যি ছিলাম। নিজের মতো ঘুরতাম, ফিরতাম। হঠাৎ একদিন দেখি, আমার চারপাশে হইচই। গাড়ি, লোকজন, ক্যামেরা। মনে হল, নিশ্চয়ই কোনও বড় শিকার সামনে পড়েছে। কে জানত, শিকারটা আসলে আমিই!

আমাকে নাকি বক্সায় নিয়ে যাওয়া হবে। বক্সা! নামটা শুনেই একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম। পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, নদী আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, বাঘ নেই। মানে, আমি না আসা পর্যন্ত ছিল না। বাঘ ছাড়া ব্যাস প্রকল্প—এমন একটা ব্যাপার। অনেকটা দাঁত ছাড়া বাঘের মতো। নামেই বাঘ, কাজে বাঘ নয়। এবার আমার কল্যাণে সেই আক্ষেপ ঘুচবে।

তবে একটা কথা বলি, আমাকে কেউ জিজ্ঞেসই করল না, আমি বক্সায় যেতে চাই কি না। গণতন্ত্রে নাকি মানুষের মতামতের খুব দাম। বাঘের মতামতের দাম কত, তা অবশ্য সংবিধানে লেখা নেই। থাকলে হয়তো জানাতে পারতাম, বিহারের জঙ্গল ছেড়ে বাংলার জঙ্গলে আসার আগে আমারও একটু মানসিক প্রস্তুতির দরকার ছিল।

তারপর একদিন খোদ মুখ্যমন্ত্রী এসে আমাকে ছেড়ে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী! আমার মতো নিরীহ প্রাণীর জন্য এত বড় আয়োজন দেখে নিজেরই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে মনে ভাবলাম, হে বাঘেশ্বর, এ যে দেখি রাজকীয় ব্যাপার! আমার মতো বাঘের ভাগ্যে এমন সম্মান জুটল! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সম্মানটা কি আমাকে দেওয়া হচ্ছে, নাকি আমাকে দিয়ে অন্য কোনও সম্মান আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে?

সে যাকগে। বাঘের অত রাজনীতি বুঝে কাজ নেই। জঙ্গলে এসে প্রথমই চারপাশটা একটু ঘুরে দেখলাম। নতুন জায়গা। নতুন গন্ধ। নতুন গাছপালা। অচেনা পথ। মনে মনে বললাম, বেশ, এখানেই এবার সংসার পাততে হবে। কিন্তু মুশকিল হল, আসার সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও কলার না কী একটা স্টেটে দেওয়া হল। আমি কোথায় যাচ্ছি, কী

করছি, সব নাকি ট্র্যাক করা যাবে। বোঝা কাণ্ড। আমার বুঝি প্রাইভেসি বলে কিছু থাকতে নেই! সারাক্ষণ আমার গতিবিধির ওপর এত নজরদারি কেন? আমি কি জঙ্গি নাকি? কদিন পর আমার জন্য নাকি সঙ্গী আনা হবে। গোপনে একটু প্রেমালাপ করতেও পারব না?

জঙ্গলে ঢুকেই একটা খবর কানে এল। জয়ন্তী, বক্সা, লেপচাখার স্থানীয় বাসিন্দাদের নাকি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকরাও নাকি আর জয়ন্তীতে রাত কাটাতে পারবেন না। আমি তো শুনে থ! কেন ভাই? আমি কি বাঘ, না জমিদার? আমার জন্য মানুষকে ঘরছাড়া হতে হবে কেন?

বাঘের নাম শুনে মানুষের ভয় পাওয়ার একটা ইতিহাস আছে। সেটা অস্বীকার করছি না। আমার পূর্বপুরুষেরা কেউ কেউ যে মানুষের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রাখতেন না, সে কথাও জানি। তবে সব বাঘ এক রকম হয় নাকি? মানুষের মধ্যেই তো কত রকমফের। কেউ সাধু, কেউ চোর, কেউ আবার সাধুর বেশে চোর। বাঘের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের তফাত থাকতে পারে।

আমি তো এখনও কারও কোনও ক্ষতি করিনি। বক্সায় এসেছি সবে। শুনেছি,



এখানে নাকি সরকার বদলেছে। তাতে অবশ্য আমার তেমন কিছু যায় আসে না। আমি তো ভোটার নই। তবে মানুষকে বিশ্বাস নেই। কোনদিন বলবে, বাঘেদের এসআইআর হবে। পূর্বপুরুষদের নিয়ে টানাটানি চলবে। বাবার নামের পদবী কী, মায়ের বাপের ঘরের পদবী কী। তারপর হঠাৎ বলবে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। কী জানি, হয়তো বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করবে। তবে আপাতত চিন্তা নেই। আপাতত আমিই ভিআইপি। আমাকে নিয়ে এখন নানারকমের আদিখ্যেতা চলবে।

পায়ে পড়ি বাঘমামা—এ কথা তো মানুষের বলার কথা ছিল। এখানে দেখি উল্টো ব্যাপার। আমারই যেন বলা উচিত, পায়ে পড়ি ভাই, আমাকে নিয়ে

এত বাড়াবাড়ি কোরো না! তারপর শুনলাম, এই বাঘ আসায় নাকি পর্যটন বাড়বে। এ তো ভারী মজার কথা।

আমি বনে থাকব, মানুষ দূর থেকে আমাকে দেখার আশায় আসবেন, হোটেল ভরবে, গাড়ি চলবে, দোকানে বিক্রিবাটা বাড়বে। আমার ছবি তুলে কেউ সামাজিক মাধ্যমে লিখবেন, ‘আজ জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা!’ আর কেউ যদি আমাকে দেখতে না পান, তা হলে লিখবেন, ‘বাঘ দেখলাম না, সব পয়সা জলে!’ এত সব দায়িত্ব আমার একার কাঁধে?

তারপর যদি কোনও দিন আমার মেজাজটা একটু খারাপ থাকে? ধরুন, সারারাত ঘুম হয়নি। পেটে খিদে। জঙ্গলের মধ্যে খাবার খুঁজছি। এমন সময় সামনে একটা মানুষ পড়ে গেলেন। আমি তাঁর দিকে তাকলাম, তিনিও আমার দিকে তাকালেন। দুজনেই দুজনকে দেখে চমকে উঠলাম। আমি ভাবলাম, এ আবার কোথা থেকে এল! তিনি ভাবলেন, হায় ভগবান, বাঘ! তারপর যদি তিনি দৌড়তে শুরু করেন? আমিও যদি স্বভাববশত দৌড়ই? যদি ভুল বোঝাবুঝিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়? ব্যস! পরদিন কাগজের শিরোনাম—‘বাঘের হালুমে পর্যটনে ধস!’

সব দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কেন বাপু! বাঘের এলাকায় বাঘ থাকবে, মানুষের এলাকায় মানুষ থাকবে—এই সীমানাটা দুই পক্ষেরই বোঝা দরকার। আর সেই বোঝাপড়ার ব্যবস্থা না করে শুধু বাঘ এনে পর্যটন বাড়ানোর স্বপ্ন দেখলে বিপদ আছে বইকি। কেননা, পর্যটকরা বাঘ দেখতে আসেন ঠিকই, কিন্তু বাঘের পেটে যেতে আসেন না।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি মোটেই পর্যটনবিরোধী নই। বরং পর্যটন বাড়লে আমারও সুবিধে হতে পারে। জঙ্গলের রাস্তা ভালো হবে, জলাশয় পরিষ্কার হবে, বনরক্ষীদের নজরদারি বাড়বে। জঙ্গলের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমারও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আমার এখন অনেক কাজ। এলাকার পথঘাট চিনতে হবে, কোথায় জল পাওয়া যায় জানতে হবে, কোন দিকে গেলে নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম মিলবে বুঝতে হবে। তার মধ্যে শুনছি, আমার জন্য নাকি মানুষের বসবাসে সমস্যা! যারা কয়েক পুরুষ ধরে এখানে আছেন, সেই স্থানীয় মানুষকে সরিয়ে দিলে তাঁরা যাবেন কোথায়? তাঁদের জীবিকা কী হবে? যে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই জঙ্গলের সঙ্গে বসবাস করছেন, তাঁরা কি হঠাৎ করে জঙ্গলের

শত্রু হয়ে গেলেন?

আমার পূর্বপুরুষেরা আমাকে একটা কথা শিখিয়ে গিয়েছেন। জঙ্গল শুধু গাছপালা আর জন্তুর নাম নয়। সেখানে হরিণ আছে, হাতি আছে, পাখি আছে, পোকামাকড় আছে। আর জঙ্গলের আশপাশে আছে মানুষও। তাদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, স্মৃতি—সব মিলিয়েই একটা অঞ্চল। সেই ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট করে আমাকে একা বসিয়ে রাখলে লাভ কী?

আমাকে যদি বন্ধায় আনার উদ্দেশ্য হয় বাঘের সংখ্যা বাড়ানো, তা হলে অবশ্যই ভালো কথা। বাঘ থাকা দরকার। জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে তার ভূমিকা আছে। কিন্তু বাঘের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, পর্যাপ্ত শিকার, নিরাপদ চলাচলের পথ, নিয়মিত নজরদারি—এসবেরও তো দরকার। শুধু একটা বাঘ ছেড়ে দিয়ে ব্যাস প্রকল্পের গায়ে বাঘের ছবি সেঁটে দিলেই তো আর সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না!

আরও শুনছি, আমার পরে নাকি আরও দুটো বাঘ আসবে। বাবা রে! এক রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! আমি একা এসেই এত আলোচনা, এত



আয়োজন, এত বিধিনিষেধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। আরও দুজন এলে কী হবে? তখন কি আমাদের জন্য আলাদা পঞ্চায়েত বসবে? নাকি তিনজনের নামে তিনটে আলাদা পর্যটন প্যাকেজ চালু হবে? আগের মুখ্যমন্ত্রী নাকি নামকরণের ব্যাপারে বিখ্যাত ছিলেন। সুযোগ পেলেই যার তার নাম দিয়ে দিতেন। এই রোগগুলো কিন্তু খুব ছোঁয়াচে। নাম দেওয়ার সুযোগ পেলে কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। কী জানি, আমাদেরও হয়তো বিচিত্র সব নাম দেওয়া হবে। একেবারে ‘সনাতনী’ ছাপ্লা মারা নাম। বাঘ হওয়ার কত জ্বালা বলুন তো! এক তো রেডিও কলার পরিয়ে দিলি। তারপর যা খুশি নাম দিয়ে দিবি! আমাকে নিয়ে একটা কথা খুব চালু আছে, বাঘ, তুই ভাগ। যদিও এটা মানুষের বলার কথা। কিন্তু মানুষ যদি আমাকে নিয়ে অতিরিক্ত

আদিখ্যেতা করতে থাকে, তা হলে আমিই একদিন বলব, বাঘ তুই ভাগ! মানে, আমি নিজেই পালাব। এত ঝামেলা সহ্য করার চেয়ে অন্য জঙ্গলে চলে যাওয়া ভালো।

তবে একটা সমস্যা আছে। আমাকে যদি আবার অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চায়, তখন তো আর পালানোর উপায় নেই। আবার গাড়ি, আবার লোকজন, আবার ক্যামেরা। তার চেয়ে এখানেই থিতু হওয়া ভালো। যদি মানুষজন একটু বুঝে শুনে চলেন।

আর একটা কথা না বললেই নয়। আমার নামে এত হইচই হচ্ছে, অথচ আমার নিজের মতামত নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। একটা হরিণের মতামত নেওয়া হয় না, একটা হাতির মতামত নেওয়া হয় না, বাঘেরও হয়

না। অথচ এই সব প্রাণীদের ঘিরেই তো বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের এত আয়োজন। মানুষ নিজেদের সুবিধেমতো জঙ্গলের মানচিত্র আঁকেন। কোথাও পর্যটনকেন্দ্র হয়, কোথাও রাস্তা হয়, কোথাও রিসর্ট হয়। তারপর একদিন মনে হয়, আরে, বাঘ তো নেই! তখন বিহার থেকে বাঘ নিয়ে আসতে হয়। আমি অবশ্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না। আমি তো আর প্রেস কনফারেন্স করতে পারি না। রেডিওতে ‘মন কী বাত’ বলতে পারি না। আমার কথাগুলো আপনাদেরই বুঝে নিতে হবে।

শুধু একটা অনুরোধ, আমার নামে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা আমি রাখতে পারব না। আমাকে এনে পর্যটন বাড়ানোর স্বপ্ন দেখতেই পারেন। কিন্তু পর্যটক আসবেন কি না, সেটা নির্ভর করবে অনেক কিছুই ওপর। রাস্তা, যোগাযোগ, থাকার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, জঙ্গলের পরিবেশ—সব কিছুই ওপর। শুধু আমি একা কতটা জনপ্রিয় হলাম, তার ওপর নয়। আর আমার জন্য যদি স্থানীয় মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের জীবনযাপনে বাধা পড়ে, তা হলে সেটা যেন আমার ঘাড়ে না চাপানো হয়। আমি এখানে কাউকে তাড়াতে আসিনি। আমি এসেছি নিজের মতো করে বাঁচতে।

আপনারা মানুষ। আপনাদের বুদ্ধি আছে, আইন আছে, পরিকল্পনা করার ক্ষমতা আছে। আপনারা নিশ্চয়ই এমন ব্যবস্থা করতে পারবেন, যাতে বাঘও থাকে, মানুষও থাকে, পর্যটনও বাড়ে, জঙ্গলও বাঁচে।

শেষে একটা কথা বলি। মানুষের মুখে শুনেছি, ‘তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত?’ আমাকে দেখে হয়তো অনেকেই এই প্রশ্ন করবেন। বস্ত্রার জঙ্গলে কে এল, কোথা থেকে এল, কী তার পরিচয়—এসব নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু আমি চাই, একদিন মানুষ প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে করুন। ‘বাঘটা এখানে এসে কেমন আছে?’ এই প্রশ্নের মধ্যেই আমার বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা লুকিয়ে আছে।

আমি ভালো থাকলে জঙ্গল ভালো থাকবে। জঙ্গল ভালো থাকলে হরিণ থাকবে, পাখি থাকবে, হাতি থাকবে। আর জঙ্গল ভালো থাকলে মানুষও তার সুফল পাবে। পর্যটনও তখন আপনাআপনি বাড়তে পারে।

তাই পায়ে পড়ি বাঘমামা বলে আমাকে তুষ্ট করার দরকার নেই। আমার নামে বড় বড় পোস্টারও ছাপতে হবে না। শুধু জঙ্গলটাকে জঙ্গল থাকতে দিন। তার ভিতরে থাকা



প্রাণীদের বাঁচতে দিন। আর জঙ্গলের পাশে থাকা মানুষগুলোকেও তাঁদের মতো করে বাঁচার সুযোগ দিন।

আমি কথা দিচ্ছি, অকারণে কাউকে ভয় দেখানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—আমি বাঘ। আমারও আত্মসম্মান আছে। আমাকে সার্কাসের বাঘ বানিয়ে ফেলবেন না যেন!

আর হ্যাঁ, পর্যটকদের বলবেন, আমাকে দেখতে এলে একটু ধৈর্য ধরতে। আমি কোনও সিনেমার নায়ক নই যে ডাক দিলেই ক্যামেরার সামনে হাজির হব। আমি কখনও ঝোপের আড়ালে থাকব, কখনও দূরের পাহাড়ে চলে যাব, কখনও হয়তো সারাদিন ঘুমোব। তাতে রাগ

করবেন না। আমাকে দেখতে না পেলে জঙ্গল দেখবেন। পাখির ডাক শুনবেন। গাছের ছায়ায় বসবেন। নদীর জল দেখবেন। হয়তো বুঝতে পারবেন, জঙ্গলের সৌন্দর্য শুধু বাঘের গায়ে ডোরাকাটা দাগে আটকে নেই।

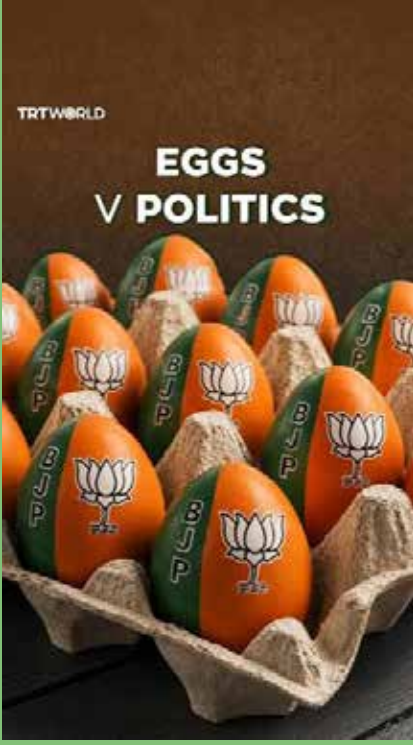
আর যদি কোনও দিন সত্যিই আমার মুখোমুখি হয়ে যান, তা হলে দয়া করে আমার সঙ্গে সেলফি তুলতে যাবেন না। আমার অটোগ্রাফেরও প্রয়োজন নেই আপনার। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বনকর্মীদের নির্দেশ মেনে চলবেন। আপনারা আপনাদের মতো বাঁচুন, আমাকেও আমার মতো বাঁচতে দিন।

কারণ, বক্সায় বাঘ ফিরেছে—এই খবরটা যেন একদিন সত্যিই আনন্দের খবর হয়ে ওঠে। মানুষের উৎখাতের, আতঙ্কের কিংবা দুর্ঘটনার খবর নয়।

ইতি,

বক্সার নবাগত বাঘমামা।

পুনশ্চ: আরও দুটো বাঘ আসছে শুনলাম। ওদের বলে দেব, ভাই, এখানে আসার আগে ভালো করে ভেবে এসো। জঙ্গলটা সুন্দর, কিন্তু মানুষের প্রত্যাশার ভারটা বড্ড বেশি!



আপনার হাতে রইল শুধুই ডিম, ঘোড়ার ডিম

স্বরূপ গোস্বামী

ডিমের বড়ই দুঃখ। কোনওদিনই সে বেচারী প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। বিয়েবাড়িতে চিকেন, মাটনের কতরকম পদ। এমনকী নানা রকমের মাছের আইটেমও আছে। কিন্তু ডিম! মেনু কার্ডে সে বেচারার ঠাঁই হয় না।

খাঁসির মাংস আটশো টাকা ছাড়িয়ে গেছে। চিকেনও আড়াইশো। যদি নখরকান্তি ইলিশ নিতে যান, অন্তত হাজার টাকা পকেটে রাখুন। চিংড়ি? সে ব্যাটাও পাঁচশো ছাপিয়ে গেছে। অথচ ডিম! তার দাম যদি আট টাকা থেকে সাড়ে আট টাকা হয়ে যায়, গেল গেল রব ওঠে। ডিমের জন্য ওটুকু খরচও করা যাবে না।

কোথাও যাওয়ার আগে ডিম খাওয়া যাবে না। সেটা নাকি অপবিত্র। ডিম খেয়ে গেলে নাকি ‘যাত্রা’ শুভ হয় না। অথচ, ‘শুভ জন্মদিন’ লেখা কেক আবার ডিম দিয়েই বানানো।

যাই হোক, ইদানীং ডিমের কদর বেড়েছে। বেড়েছে না কমেছে, সেটা ডিমই জানে। এখন যাকে-তাকে ডিম ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। টিভিতে সেইসব দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। কেউ কেউ নাম দিয়েছেন ডিম থেরাপি। ডিম নাকি প্রতিবাদের অস্ত্র। এত ব্যবহারে মোমবাতি আজ পুরনো। নতুন কোনও আইটেম চাই। অতএব, ডিম ছোঁড়ো।



প্রথম প্রথম এটাকে জনরোষ বলে চালানো হচ্ছিল। মিডিয়াও ফলাও করে তেমনটাই প্রচার করছিল। কী জানি, হয়তো রাগ ছিলও। এতদিনের পুষে রাখা রাগ যদি ডিম ছুঁড়ে একটু কমে, মন্দ কী! কিন্তু যত দিন গেল, পাবলিক হাওয়া হয়ে গেল। আসলে, পাবলিক বলে চালালে দলে নম্বর বাড়বে না। তাই এখন ডিম ছুঁড়েই জয় শ্রী রাম স্লোগান। বা রে! এটার ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়তে হবে না! দলের নেতারা যদি ফোন ঘাঁটতে গিয়ে একবার দেখে ফেলেন। অন্তত পঞ্চায়েত বা পুরসভায় টিকিট পাওয়ার দাবিদার তো হওয়া বাবে!

একটু ডিম ছোঁড়ো, আর চোর চোর বলে চিৎকার করো। ফোকটে পাবলিসিটির জন্য আর কী চাই! বেশ একটা ‘পোতিবাদী’ ‘পোতিবাদী’ ইমেজ। ঠিক যেন নয়ের দশকের ‘পোসেনজিৎ’। বেচারী ডিম!

সে একদিকে প্রচারে একটু কক্ষে পেল। অন্যদিকে মিড ডে মিল থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

আসলে, কারও হেনস্থা হলে আমরা বেশ মজা পাই। তারিয়ে তারিয়ে অন্যের অপদস্থ হওয়া উপভোগ করি। তাই কাউকে ডিম ছোঁড়া হচ্ছে দেখলে বেশ একটা বিকৃত আনন্দ পাই। এই আনন্দ পেতে পেতে জনরোষ যে কবে পলিটিকাল ইভেন্ট হয়ে গেছে, বুঝতেই পারিনি। প্রতিবাদ যে কবে অসভ্যতা হয়ে উঠেছে, টেরই পাইনি।

আসলে, ভক্ত হওয়ার বেশ একটা মজা আছে। নিজেকে বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু ভাবতে হয় না। যুক্তি দিয়ে বিচার করতেও হয় না। হোয়াটসঅ্যাপে যে সব ভিডিও বা লিঙ্ক আসে, সেগুলো দেখলেই হয়। ইউটিউব তো আছেই। একবার ডিম ছোঁড়ার ভিডিও দেখলে বারেকবারে সেই লিঙ্কই আসবে।



কারণ, ফেসবুক বা ইউটিউব ততদিনে বুঝে নিয়েছে, আমি এই দৃশ্যই দেখতে চাই। কেউ উল্টো যুক্তি দিচ্ছে! দেশদ্রোহী বলে দাও। লোকে এটাও কিন্তু হেঁচি খাচ্ছে।

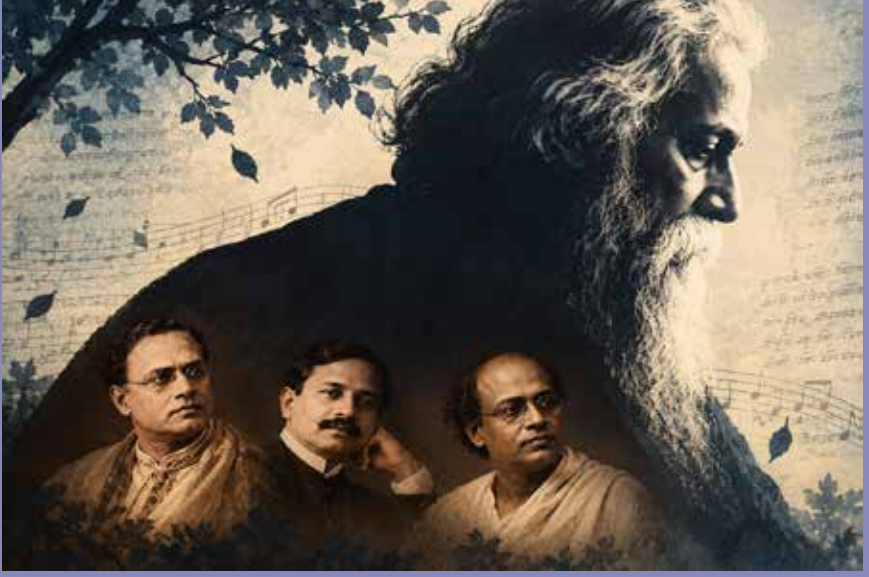
আপনি তৃণমূলকে চোর চোর বলে এতদিন গালি পাড়লেন। কোন সময়ে তৃণমূলের কুড়ি জন এম পি দিল্লিতে উড়ে গিয়ে এনডিএ-র শরিক হয়ে গেল, বুঝতেও পারেননি। এতদিন এঁদেরই চোর, দেশদ্রোহী, চটিচাটা—কতকিছুই না বলেছেন। এবার মালা নিয়ে তৈরি থাকুন। শহরে এলেই পরিয়ে দিতে হবে তো! পোশাকি নাম যতই এনডিএ শরিক

হোক, আসলে এঁরা বিজেপিই হয়ে পড়েছেন। এখন মিউ মিউ করছেন, দুদিন পর আগের মতোই হুঙ্কার ছাড়বেন।

দিল্লিতে যা হচ্ছে হোক। রাজ্যে তো তৃণমূল জন্ম। ও হরি! সেই তৃণমূলের এমএলএ—রা এখন উঠতে বসতে তৃণমূলকেই গাল পাড়ছে। তাঁরা এখন আপনার থেকেও বড় বিজেপি। এবার কোন মুখে তাঁদের ‘চোর’ বলবেন! কদিন পর এঁদের বিজেপি নেতা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আপনার কীই বা করার আছে! দিল্লির ক্ষেত্রে না হয় বলেছিলেন, দেশের স্বার্থে, বিল পাসের স্বার্থে নেওয়া হল। রাজ্যের এমএলএ-দের দলবদল নিয়ে কী ব্যাখ্যা দেবেন? আপনাকে ভাবতে হবে না। ততদিনে জুতসই একটা ব্যাখ্যা ঠিক দিয়ে দেওয়া হবে। আপনি শুধু মুখস্থ রাখুন। সময় মতো উগরে দেবেন।

দিল্লি গেল। কলকাতাও গেল। বাকি পড়ে রইল কী? আপনার জেলা? আপনার শহর? আপনার গ্রাম? অপেক্ষা করুন, এখানেও তৃণমূলীকরণ ঠিক হয়ে যাবে। দিল্লির দলবদল হয়েছে ‘বৃহত্তর’ স্বার্থে। এবার না হয় ‘ক্ষুদ্রতর’ স্বার্থে। সেটা ছিল দেশের স্বার্থে, এটা না হয় হবে গ্রাম বা সংগঠনের স্বার্থে।

আপনার হাতে তাহলে কী রইল! ডিম। আস্ত একটি ঘোড়ার ডিম।



প্রকাণ্ড ছায়ার আড়ালে

অমিত ভট্টাচার্য

গান বলতেই বাঙালি সবার আগে বোঝে একজনকে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবি বলেছিলেন, বাঙালি আমার সব সৃষ্টিকে ভুলে গেলেও আমার গান তাকে গাইতেই হবে। কী খাঁটি কথাটাই না বলেছিলেন! দশকের পর দশক ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের চিন্তায়, চেতনায়, মননে। রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে আছেন বাঙালির অস্তিত্ব ও অভ্যাসে। রবি ঠাকুরের পরেই আসে কাজী নজরুলের নাম। নজরুলের গানের সঙ্গেও বহুকাল ধরেই একাত্ম হয়ে আছে বাঙালি।

এই দুই বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড ছায়ায় কিছুটা যেন ঢাকা পড়ে গেছেন গানের জগতের আরও অনেক দিকপাল মানুষ। তেমনই তিন বরেণ্য শিল্পী অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন। তিনজনই মোটামুটি সমসাময়িক। তিনজনেরই কর্মজীবনের

অনেকটা সময় কেটেছে বাংলার বাইরে। তিনজনই নিজ নিজে পেশায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। তিনজনই জড়িয়ে ছিলেন আইন ও প্রশাসনের সঙ্গে। অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত ছিলেন আইনজীবী। অন্যদিকে, দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু বাঙালি এইসব পরিচিতি ছাপিয়ে তাঁদের মনে রেখেছে গানের জন্যই।

কিন্তু বাঙালি কতটুকুই বা চেনে এই তিন শিল্পীকে? এখানেও রয়েছে মস্ত বড় এক ধোঁয়াশা। কাউকে বলুন একটা রজনীকান্তর গান গাইতে। তিনি হয়তো এদিক-ওদিক তাকাবেন। অনেক ভেবে বলবেন, ঠিক মনে পড়ছে না। বাঙালি কি সত্যিই রজনীকান্তর গান শোনেনি? বাঙালি কি সত্যিই রজনীকান্তর গান জানে না? তাও নয়। সে গানটা জানে। কিন্তু এটা যে রজনীকান্তেরই গান, সেটা জানে না। একই কথা অতুল প্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁদেরও অনেক গানই বাঙালি জানে। আপন মনে গুনগুন করে গায়। কিন্তু এগুলো কার গান, সেটা হয়তো জানে না।

যেমন, ‘তুমি নির্মল করো, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে’। এই গানটা কোন বাঙালি না শুনেছেন? দীপাবলির আবহে গানটা বেজে ওঠে। পান্নালালের কণ্ঠের এই গানকে আমরা শ্যামাসঙ্গীত বলেই জেনে এসেছি। এটি আসলে রজনীকান্ত সেনের লেখা ও সুর করা গান। ঠিক তেমনই, স্বদেশী গান বলতেই আমরা গেয়ে উঠি, ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়/মাথায় তুলে নে’রে ভাই/দিনদুখিনী

মা যে তোদের/তার বেশি আর সাধ্য নাই।’। এটিও কিন্তু রজনীকান্তেরই গান।

ঠিক তেমনই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া ‘খন্যধান্যে পুষ্পভরা/আমাদের এই বসুন্ধরা/তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।’ এই গানটি কোন বাঙালি না জানেন? এই গানটির পিছনে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম অবশ্য বাঙালি জানে। কিন্তু তাঁর অনেক গান বাঙালি জানলেও সেগুলি যে ডিএল রায়েরই গান, তা হয়তো বাঙালি জানে না। যেমন, ‘ওই মহাসিন্ধুর পার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে’ গানটি আমরা চিনি মান্না দের গান হিসেবে। অবশ্যই মান্না দের কণ্ঠে গানটি জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু সেই গানের স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল। ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ গানটির কথাও আমাদের অজানা নয়। ঠিক তেমনই, ‘আমরা এমনি এসে ভেসে যাই,/ আলোর মতন হাসির মতন,/কুসুম-গন্ধ-রাশির মতন,/হাওয়ার মতন নিশার মতন,/চেউয়ের মতন এসে যাই।’ — এই গানটি আমরা অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবি। এমনকী কেউ কেউ পাঁচিশে বৈশাখও দিব্যি এই গান গেয়ে ফেলেন। এটিও আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের গান।

এবার অতুলপ্রসাদ। জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই কেটেছে বাংলার বাইরে। কিন্তু তাঁর একের পর এক গানে আন্দোলিত হয়েছে বাঙালি। কখনও তা হয়ে উঠেছে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র। কখনও আবার বাঙালির জাতাভিমান, বাঙালির প্রেম ধরা দিয়েছে সেই গানে। ‘উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ



আদি জগত জন পূজ্যা, দুঃখ দৈন্য সব নাশি
করো দূরিত ভারত-লজ্জা।’ এই গানই
হোক বা ‘বল, বল, বল সবে, শত বীণা-
বেণু-রবে, ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ
আসন লবো।’ বা ‘হও ধরমেতে ধীর, হও
করমেতে বীর/হও উন্নত শির, নাহি ভয়।’
এই তিনটি গানই বিভিন্ন স্কুলের প্রার্থনা
সঙ্গীত। ছোট থেকেই আমরা শুনে আসছি।
স্বাধীনতা দিবসের আবহে এখনও পাড়ায়
পাড়ায় বেজে ওঠে। কিন্তু আমরা অনেকেই
হয়তো জানি না, এগুলি অতুল প্রসাদের গান।
ঠিক যেমন, ‘মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা।’ গানটি শুনলেই মনে
হয়, এটি বোধ হয় এটি বোধ হয় পূর্ববঙ্গের
গান। বাংলাদেশের বঙ্গুরা যতটা একাত্মতার
সঙ্গে গানটি গান, আমরা বোধ হয় ধরে
নিয়েছি, এটি একুশে ফেব্রুয়ারির গান। অথচ,
এই গান লেখা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের
কত আগে! ঠিক তেমনই, ‘আমায় রাখতে
যদি আপন ঘরে/বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাই’
গানটি অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আসলে এটি অতুলপ্রসাদের। স্বদেশপ্রেমের
গান যতটা নাড়া দেয়, প্রেমের গানও ততটাই
ভাবিয়ে তোলে। তেমনই একটি জনপ্রিয় গান
— ‘বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে /আমিও
একাকী, তুমিও একাকী, /আজি এ বাদল
রাতে, নিদ নাহি আঁখিপাতে।’

তিনজনই রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। জন্ম
প্রায় কাছাকাছি সময়ে। তিনজনের সঙ্গেই
রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক ছিল। একমাত্র
দ্বিজেন্দ্রলাল একটা সময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে
কিছুটা বক্রোক্তি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা
দুজন একে অন্যকে বই উৎসর্গ করছেন।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ নামক প্রকাণ্ড এক
সূর্য। যাঁর আলোর কাছে সবকিছুই ম্লান
মনে হয়। কিন্তু এই তিন কবি ও গীতিকার
আপন আপন প্রতিভায় অমূল্য সব গান
উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁদের মৃত্যুর শতবর্ষ
পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বাঙালি সেই গানকে
ভোলেনি। গানের মাঝেই তাঁদের অমরত্ব।



কবিতা বেঁচে থাকুক গান হয়ে

বৃষ্টি চৌধুরি

আমাদের বেড়ে ওঠা আর আপনার গানের বেড়ে ওঠা প্রায় সমসাময়িক। আমাদের বেড়ে ওঠা মূলত নয়ের দশকে। বাংলা গান কোন খাতে চলছে, বোঝার মতো বয়স তখন হয়নি। যা গান চারপাশে বাজত, তাই শুনতাম। আশিকি, সাজন যেমন শুনতাম, তেমনি গুরুদক্ষিণা-অমরসঙ্গীও বেজে উঠত। বড় পিসি শুনতেন পুরানো বাংলা গান। আবার ছোট কাকা তখনকার নানা হিন্দি ছবির হিট গান। দুরকম গানই কানে আসত। গুনগুন করে সাজনের গানও গাইতাম, আবার লতা-সন্ধ্যার গানও গাইতাম।



তখন লিটল ম্যাগে দু
একটা কবিতা লেখার
হাতেখড়ি। অনেক
কবিদের নাম জেনে
ফেলেছি। হঠাৎ দেখলাম,
জনপ্রিয় কবিতাগুলি
একে একে গান হয়ে
উঠছে। আবার আসিব
ফিরে থেকে বেনীমাধব।
শুরুতে কিছুটা খটকা
লাগত। পরে দেখলাম,
কানে দিব্যি সয়ে গেল।
জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে
‘আবার আসিব ফিরে’
শুনতে তাঁরও ভালই
লাগত। বেনীমাধব
পড়েছেন যত না লোক,

সুমন তখন কিছুই বুঝতাম না। ভালও
লাগত না। তুলনায় নচিকেতা বেশি নাড়া
দিয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে তখন অনেকেই
রিমেক গাইতেন। বেশ কয়েকটা নাম মনে
আছে। একটু একটু করে শুনলাম আপনার
গান। একেবারে নতুন গান তো। একটু
অচেনা ঠেকত। একদিন মঞ্চেও আপনার
অনুষ্ঠান দেখলাম। হারমোনিয়াম নিয়ে বসে
গান গাওয়া নয়। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে,
একেবারে উদাত্ত কণ্ঠে। একেবারে যেন
অন্য একটা ঘরানা। দেখতে দেখতে সেইসব
গানের তিন দশক হয়ে গেল, তাই না!

গান হিসেবে শুনেছেন তার থেকে ঢের
বেশি লোক। আশা করি, জয় গোস্বামীও
একমত হবেন। আসলে, আপনার গাওয়া
বেনীমাধবের সুরটা কানে লেগে আছে
বলেই গৌতম হালদারের সেই পরীক্ষা
নিরীক্ষা ভাল লাগেনি।

খুব আক্ষেপ করতাম, বাঙালি কবিতা
শোনে না। কিন্তু সেই কবিতা বিমুখ
বাঙালিই যেন একটু একটু করে
কবিতাকে ভালবাসতে শিখল।
কিছুটা কৃতিত্ব যদি ব্রততীর হয়,



তবে গানের জগতে সেই কৃতিত্ব আপনাকেই দিতে হয়। আরও একজনের কথা বলতেই হয়, যিনি সবসময় আড়ালেই থাকতে চেয়েছেন, সেই সমীর চট্টোপাধ্যায়।

আপনার গানের সঙ্গে ওই নামটাও জড়িয়ে আছে। অথচ, মানুষটাকে সত্যিই কোনওদিন টিভিতে বা অন্য কোথাও আসতে দেখিনি। কোথাও তাঁর কোনও সাক্ষাৎকার পড়েছি বলেও মনে করতে পারছি না। তবে আপনার মুখে বারবার ওই নামটা শুনি। সম্প্রতি সেই মানুষটা চিরতরে হারিয়ে গেলেন। ভাল লাগে, খ্যাতি পেয়েও, প্রতিষ্ঠা পেয়েও ওই আড়ালের মানুষটাকে আপনি ভোলেননি। বারবার কৃতজ্ঞ চিন্তে তুলে এনেছেন সেই মানুষটার নাম।

মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়, আবার রাগও হয়। বাংলা ছবি আপনাকে সেভাবে ব্যবহারই করতে পারল না। ‘সেদিন চৈত্রমাস’ ছবির কথা মনে পড়ছে। আপনার কণ্ঠে অসাধারণ একটা গান দিয়েছিলেন সুমন—‘সূর্য তাকেই দেখতে চায়, আকাশ তাকেই ডাক পাঠায়।’ গানটি যেন আপনার জন্যই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরে আর সেভাবে ব্যবহার করা হল না কেন? কারা সঙ্গীত পরিচালনা করেন, তাঁরা কী চান, জানতে খুব ইচ্ছে করে।

গানের বাজারটাও দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। ক্যাসেটের দিন ফুরিয়ে গিয়ে এল সিডি। সেও চলে গেল কালের গর্ভে। এখন গান মানেই ইউটিউব।



ডাউনলোডের দুনিয়ায় গান শোনার চেনা যন্ত্রগুলোই হারিয়ে গেল। কলেজে বা পাড়ায় সেই অনুষ্ঠানের চলও দেখি না। কারণ, কলেজে ভোট না করিয়ে যারা ক্ষমতায় আসছে, তারা আর যাই হোক, লোপামুদ্রার গান শুনবে না। সেই শিক্ষা, সেই রুচি কোনওটাই তাদের নেই। পাড়া বা ক্লাবে অনুষ্ঠানের যারা হোতা, সেই মানুষগুলোও তো বদলে গেছে। তারাই কি লোপামুদ্রা শোনে? মনে হয় না। সংস্কৃতির দুনিয়ায় বড় তাড়াতাড়ি যেন একটা শূন্যতা নেমে এল। ধামাধরা ‘অনুপ্রেরণা’জীবীদের ভিড়ে আপনাকে কখনই দেখা যায়নি। আপনি স্বতন্ত্র ছিলেন, আজও দিব্যি আছেন।

হতাশ হবেন না লোপা। আপনি যেমন আছেন, তেমনই থাকুন। গান নিয়ে নতুন

নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। শুনলাম, কবিতা নিয়ে নাকি আর গান করবেন না। হয়ত হতাশা থেকে বলেছেন। হয়ত না ভেবেই বলেছেন। প্লিজ লোপা, কবিতা থেকে গান গাওয়া বন্ধ করবেন না। সমীরবাবু না হয় নেই। আর কেউ কি কবিতায় সুর দিতে পারবেন না? ঘরেই তো আছেন এক কৃতি সুরকার। একটু না হয় তাঁকেই ধমকে চমকে সুর করান। মন থেকে বিশ্বাস করি, জয় সরকার চেষ্টা করলে পারেন। সেই গান যদি তিনি অন্য কাউকে দিয়ে গাওয়ানোর চেষ্টা করেন! কোমর বেঁধে ঝগড়া করুন। চিল চিৎকার করে পাড়া মাতিয়ে দিন। ওই গান আপনার, শুধু আপনার।

কবিতাগুলো বেঁচে থাক, নতুন করে প্রাণ ফিরে পাক আপনার কণ্ঠে।



সেই তো থিলার আর ভূত

মলয় সেন

গত কয়েকবছরে একটা অদ্ভুত ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। শহরের নানা প্রান্তে বিশাল হোর্ডিং। সিনেমার নয়, সিরিয়ালেরও নয়। আসলে, ওয়েব সিরিজ। সিনেমা হল, টিভির বাইরেও খুলে গেছে অন্য একটা দিগন্ত। অর্থাৎ, হলে যাওয়ার দরকার নেই। টিভির সামনে বসারও দরকার নেই। মোবাইলেই মগ্ন থাকুন। সেখানেই যা দেখার, দেখে নিন।

একের পর এক ওটিটি চ্যানেল হাজির হয়ে গেছে। নিত্যনতুন কনটেন্ট নিয়ে তারা হাজির। বিনোদন জগতের নতুন দরজা যেন খুলে গেছে। কত নতুন নতুন কনটেন্ট নিয়ে ছবি হচ্ছে। প্রথমত, এখানে বাজেট অনেকটাই কম। ফলে, এমন অনেক কনটেন্ট শুনে থোড়িউসার পালিয়ে যান। কিন্তু এখানে অল্প বাজেট। ফলে সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অন্যাসে করা যায়। বড়সড় তারকা নিতে পারলে ভাল। না নিলেও ক্ষতি নেই। একটা পরিচিত মুখ থাকলেই হল। তিনি টেনে নিয়ে যাবেন। বাকি দু'একজন অল্প পরিচিত। বাকিরা আনকোরা হলেও চলে যায়।

কিন্তু অল্প টাকায় ছবি হলে তার কিছু ভাল দিক যেমন থাকে, তেমনই কিছু বেনোজলও ঢুকে পড়ে। যে পারছেন, পরিচালক হয়ে যাচ্ছেন। রিসার্চের নামে যা খুশি গেলানো হচ্ছে। শহরজুড়ে হোর্ডিং, তার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ায় লাগাতার ক্যাম্পেইনিং তো আছেই। লোকে ভাবছেন, দারুণ কিছু কনটেন্ট। কিন্তু একটা বা দুটো পর্ব দেখার পরই মোহভঙ্গ হতে সময় লাগছে না।

আবার কোনও কোনও ওয়েব সিরিজ যেন সিরিয়ালেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। মেগা সিরিয়াল যেমন বছরের পর বছর চলে, এটাও তেমন দশ এপিসোড, বারো এপিসোডে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিরিয়াল যদি নেশা ধরতে পারে, তাহলে ওয়েব সিরিজই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এখানেও ঢুকে পড়ছে পরকীয়া। ঢুকে পড়ছে মেলোড্রামা। ঢুকে পড়ছে পারিবারিক কূটকচালি। সাসপেন্সের নামে অকাতরে ঢুকে পড়ছে ভায়োলেন্স। আর যৌনতার সুড়সুড়ি তো আছেই।

সবকিছুরই নিজস্ব খন্দের আছে। কেউ খুনখারাপি দেখতেই ভালবাসেন। কেউ ভালবাসেন সারাক্ষণ ঝগড়া দেখতে।

কূটকচালি তো দারুণ উপাদেয়। সিরিয়ালে দেখে নিজের সংসারে সেগুলো প্রয়োগ করা। মফস্বলের কত পরিবারে নিত্য অশান্তি সেইসব কূটকচালির প্রয়োগকে ঘিরে। এসব নিয়ে আর্থসামাজিক সমীক্ষা হওয়াটা খুব জরুরি। শুধু কিছু সিরিয়াল জনজীবনকে কতখানি বিষিয়ে দিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। সেই প্রবণতা এবার কি ওয়েব সিরিজের হাত ধরেও চলে আসছে!

ইদানীং নতুন একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে, সেশন ওয়ান, সেশন টু। মানে, সেশন ওয়ানে আট-দশ পর্ব। এমন জায়গায় শেষ করা হচ্ছে, যা 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। 'অন্তরে অতৃপ্তি' থেকেই যাচ্ছে। সেই অতৃপ্তি থেকেই হাজির হয়ে যাচ্ছে সেশন টু। অর্থাৎ, আরও আট-দশ পর্ব। আসলে, যেন মেগা সিরিয়ালেরই কন্টিনিউয়েশন।

ভাল কনটেন্ট অবশ্যই স্বাগত। নতুন প্রযুক্তি থেকেও মুখ ফিরিয়ে থাকার উপায় নেই। কিন্তু সেই প্রযুক্তির হাত ধরে, নতুন ধারার হাত ধরে আবার যদি সেই বিষবাস্প ঢুকে পড়ে, তা বেশ উদ্বেগের। ওয়েব সিরিজের শুরুর দিনগুলোয় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল, যাক, সিরিয়ালের কূটকচালি থেকে কিছুটা অন্তত মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু গত কয়েক বছরে আস্তে আস্তে ওয়েব সিরিজেরও সিরিয়ালীকরণ হয়ে গেল। ভাল ছবিকে যেমন আট ফিল্ম বলে দাগিয়ে দেওয়া হত, এখানেও ভাল কনটেন্ট আবার সেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে না তো!

‘প্রচলিত’ গানের আড়ালে

মুকেশ সিংহ

সেই ক্যাসেটের যুগ হারিয়ে গেছে। এমনকী সিডিও আজকাল আর তেমন দেখা যায় না। নেই সেই ইনলে কার্ড। তাই কোন গানটা কার লেখা, কার সুর— এই তথ্যগুলোও আস্তে আস্তে কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ইউটিউবে গান থাকে। একই গান নানা কণ্ঠেও থাকে। কিন্তু কার লেখা, কার সুর এই তথ্যগুলো অনেক জায়গায় সম্ভরণে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমনকী কোনও গান রিমেক হলে আগে কে রেকর্ড করেছিলেন, এই তথ্যটাও থাকে না। তাই অনেক গানের ইতিহাস বেমালুম হারিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, একজন শিল্পী একটা গান কেন রিমেক করেন? ধরে নেওয়াই যায়, সেই গানটা তিনি ছোট থেকে শুনে আসছেন। তাঁর মনের মধ্যে সেই গান স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। সেই কারণেই

এত গান থাকতে সেই গানকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই গান রেকর্ডের সময় তার কথা ও সুর কার, সেই ব্যাপারটি গায়ক জানেন না। এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

অথচ, ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। ভূমি ব্যান্ডের একটি বিখ্যাত গান— লালপাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা। ইথাই তুকে মানাইছে নাই রে, এক্কেবারে মানাইছএ নাই রে। যাঁরা গান বাজনার একটু হলেও খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন, গানটি কবি অরুণ চক্রবর্তীর লেখা। গানটি প্রথম গেয়েছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। কিন্তু এই ইতিহাস বেমালুম চেপে যাওয়া হল ভূমির সেই ক্যাসেটে। গানের কথা ও সুরের জয়গায় লিখে দেওয়া হল প্রচলিত। সত্যিই কি জানতেন না? নাকি ইচ্ছে করে ইতিহাসটাকে চেপে যেতে চেয়েছিলেন? এই বছর হল সেই কবিতার পঞ্চাশ বছর। তাই এই গানটিকে ঘিরে বিতর্ক আরও বেশি করে সামনে আসছে।

এমন প্রচলিত শব্দের আড়ালে কত গানই না থেকে গেছে। কোথাও না জানার কারণে। আবার কোথাও সচেতন ভাবে প্রচলিত শব্দের আশ্রয় নেওয়া। আবার এমন অনেক গানও আছে, যাকে আমরা অন্যভাবে চিনি। অন্য কারও গান বলে জানি। অথচ, আসল শ্রদ্ধা হয়ত অন্য কেউ। মূলত লোক গানের ক্ষেত্রেই এই বিতর্কটা আরও বেশি করে দেখা দেয়। এমন অনেক বাউল গান আছে, যার সঠিক স্রষ্টার হৃদিস পাওয়া যায় না। কোনওটা চলে লালনের নামে। কোনওটা আবার প্রচলিত বলে চালানো হয়। আবার অনেক পুরনো

গানও সেই বাউল শিল্পীদের নামেই পরিচিত। যেমন, বড়লোকের বিটি লো। গানটি স্বপ্না চক্রবর্তীর কণ্ঠে একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে ব্যান্ডের দৌলতে আরও বেশি প্রচার পায়। কিন্তু আসল শিল্পী রতন কাহার আড়ালেই থেকে যান। অনেক পরে জানা গেল, এটি রতন কাহারের গান।

গঙ্গা ছবির একটি বিখ্যাত গান। আমায় ভাসাইলি রে। ছবির সঙ্গীপ পরিচালক সলিল চৌধুরি। একটি দৃশ্যের সঙ্গে গানটি মানানসই হবে ভেবে গানটি ব্যবহার করা হয়। গেয়েছিলেন মাম্মা দে। এটি মাম্মা দে'র গান বলেই পরিচিত। কিন্তু এই গানটির আসল রচয়িতা পল্লীকবি জসীমুদ্দিন। নন্দলাল ও দেবদুলালের লোকগান। স্বপন বসুর কণ্ঠে গানটা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু এই গান আসলে সলিল চৌধুরির লেখা ও সুর। আরও এক বিখ্যাত গান— একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। অনেকের ধারণা, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্মরণ স্কুদিরাম বসু বোধ হয় এই গান গেয়েছিলেন। বেশ কিছু পুতুল নাচ বা যাত্রায় এইভাবেই দেখানো হয়েছে। অথচ, এমন কোনও স্কুদিরাম গাওয়া তো দূরের কথা, নিজের জীবদ্দশায় এমন কোনও গানের কথা শুনেও যাননি। শোনা যায়, বাঁকুড়ার কবি পীতাম্বর দাস এরকম একটি গান বেঁধে পথে পথে গেয়ে বেড়াতেন। সেই গানটিই লতা মঙ্গেশকারকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল সুভাষচন্দ্র ছবিতে। যেখানে বালক সুভাষচন্দ্র সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। এক প্রবীণ বাউল তাঁর কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন সেই কিশোরী সেই গান গাইছে। ছবির টাইটেল কার্ডে গানটি প্রচলিত বলেই উল্লেখ আছে।

আবার এমন অনেক গান আছে, যা কোনও বিখ্যাত গায়কের গান হিসেবে পরিচিত। কিন্তু গানটি আসলে অন্য কোনও বিখ্যাত গায়কের। যেমন, কী আশায় বাঁধি খেলাঘর। এক বাক্যে সবাই বলবেন, এটি কিশোর কুমারের গান। কিন্তু এটি আসলে শ্যামল মিত্রের গান। পাঁচের দশকে আধুনিক গান হিসেবে এটি আকাশবাণীতে রেকর্ড করেন শ্যামল মিত্র। গানটির কথা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের। সুর স্মরণ শ্যামল মিত্রের। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, গানটি তেমন জনপ্রিয় হয়নি। লোকের কাছে পৌঁছয়নি। প্রায় বছর পনেরো পর। শক্তি সামন্ত তখন অমানুষ ছবি করছেন। সুন্দরবনের পটভূমিতে ছবি। নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে একটি বিষাদমাখানো গান। রাত শেষে ভোর হয়ে আসছে। ছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী গান লিখতে বসলেন গৌরীপ্রসন্ন। সুর দেওয়ার কথা শ্যামল মিত্রের। কিন্তু কোনও গানই পরিচালকের পছন্দ হচ্ছে না। এমনকী গীতিকার বা সুরকার নিজেরাও সন্তুষ্ট নন। তাহলে উপায়? তখন দুজনেরই মনে পড়ল সেই পুরনো রেকর্ড করা গানটা। শ্যামল মিত্র গেয়ে শোনালেন। পরিচালকের বেশ পছন্দ। সেই গানই রাখা হল সিনেমায়। কিশোর শুরুতে বলেছিলেন, এটা আপনার গান, আপনিই গান। কিন্তু শ্যামল বললেন, আমার গলায় তো মানুষ নেয়নি। তার থেকে বরং তুমি গাও। তোমার গলায় হয়ত গানটা নতুন করে বেঁচে উঠবে।

বাকিটা তো ইত্যাহাস। এভাবেই এক গান বেঁচে থাকে অন্য কোনও পরিচিতির আড়ালে। এক স্রষ্টা থেকে যান অন্য কোনও স্রষ্টার আড়ালে।



তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে

অজয় কুমার

তিনি হুঙ্কার দিচ্ছেন। তিনি বারবার বলে চলেছেন, বিজেপিকে তৃণমূল হতে দেব না। আমাদের দরজা বন্ধ। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এ যেন, তু মান ইয়া না মান, ম্যায় তেরা মেহমান।

৪ মের পর থেকে শমীক ভট্টাচার্যের বিড়ম্বনা যেন বেড়েই চলেছে। তিনি যতই দরজা বন্ধ রাখতে চান, টেউ টোকা দিচ্ছেন। কেউ ধাক্কা দিচ্ছেন। কেউ পিছনের খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছেন।

তৃণমূলের তিন রাজ্যসভা সাংসদের হঠাৎ বোধোদয় হল। এতদিন নেত্রী তাঁদের কাছে ছিলেন মা সারদার মতো। হঠাৎ মনে হল, এই নেত্রীর সঙ্গে থাকা যায় না। এই দল আর করা যায় না। তাঁরা সটান ছুটলেন দিল্লি। এর বাড়ি, ওর বাড়ি বৈঠক। প্রথমে পদত্যাগ।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু তার কদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, এঁদের হাতেই বিজেপির পতাকা তুলে দেওয়া হল। কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ঘোষণা হল, তাঁরাই রাজ্যসভার প্রার্থী। শমীকবাবুর বিড়ম্বনাটা ভাবুন। কদিন আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সবার জন্য দরজা বন্ধ। কিন্তু তাঁকেই হাতে পতাকা তুলে দিতে হচ্ছে। তাঁকেই উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিতে হচ্ছে। এই মহান ‘দলবদলু’দের সম্পর্কে ভাল ভাল কথার যুক্তি সাজাতে হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কেউ তাঁকেই গালাগাল দিচ্ছেন। তাঁরা বুঝতেই পারছেন না যে, তাঁর কিছুই করার নেই। দিল্লি থেকে ফরমান আসছে। তাঁর মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজ্যসভা সদস্যরা না হয় পদত্যাগ করে নতুন করে জিতে এলেন। কিন্তু লোকসভার লোকেদের তো সেই সাহস হবে না। অতএব, তাঁরা যে কোথায়, তাঁরা নিজেরাও জানেন না। কখনও বলছেন, আমরা এনডিএ শরিক। কখনও বলবেন, আমরাই আসল তৃণমূল। বেচারী শমীক ভট্টাচার্য। তাঁকে দিবারাত্র এই ‘সার্কাস’ দেখে যেতে হচ্ছে।

অথচ, এই শমীক ভট্টাচার্য ছিলেন

আনুগত্যেরই প্রতীক। প্রায় তিন দশক ধরে তাঁর নাম শুনে আসছি। যখন বিজেপির একজনও বিধায়ক ছিল না, তখনও বিজেপিকে প্রাসঙ্গিক রাখতে যাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তিনি তাঁদের একজন। দুরন্ত বক্তা। পড়াশোনা আছে। রসবোধ আছে। তার থেকেও বড় কথা, এতদিনের রাজনৈতিক জীবনে একটিও অসংলগ্ন কথা বলেছেন বলে মনে পড়ছে না। শালীনতার মাত্রা বজায় রেখেও রাজনৈতিক আক্রমণ করা যায়, বাংলার রাজনীতিতে শমীকবাবু অবশ্যই তার বড় একটা উদাহরণ।

কেন জানি না, দলবদলুদের ঠিক মেনে নিতে পারি না। যিনি যে দলের, সেই দলটাই মন দিয়ে করুন, কোনও সমস্যা নেই। ‘মানুষের কাজ’ করতে এত দল বদল করতে হয় কেন, বুঝি না। যে কোনও মানুষেরই রাজনৈতিক সত্যতাটা খুব জরুরি। যেমন জরুরি বিষয় হল পড়াশোনা ও মাত্রাজ্ঞান। শমীকবাবু দল বদলাতে পারেন, এমন গুঞ্জন কখনও শুনেছেন? যে তৃণমূল দল ভাঙানোয় এত পটু, তাঁরা কি শমীককে দলে টানার চেষ্টা করেনি? নিশ্চিতভাবেই তাঁর কাছেও প্রস্তাব গিয়েছিল। তাছাড়া, তিনি নিজেও যদি একবার আগ্রহ দেখাতেন, ক্যাবিনেটে জায়গা বাঁধা ছিল। লোকসভা



বা রাজ্যসভাতেও যেতেই পারতেন।
কিন্তু ‘সওদা’ করেননি।

অথচ দল যে তাঁকে সবসময় দারুণ
মর্যাদা দিয়েছে, এমনও নয়। ২০২১ এ
যখন ৭৭ জন বিধায়ক জিতে এলেন,
দল চাইলে একজনকে রাজ্যসভায়
পাঠাতেই পারত। কিন্তু কাকে পাঠানো
হল? কোন এক অনন্ত মহারাজকে। যিনি
সকালে কী বলেন, বিকেলে কী বলেন,
নিজেও জানেন না। যিনি বিজেপির
সাংসদ হওয়ার পরেও তৃণমূল শিবিরে
প্রায় চলেই গিয়েছিলেন। তখন কিন্তু
পুরনো সৈনিক শমীকবাবুর কথা মনেও
পড়েনি। দীর্ঘদিন দলের নানা সমীকরণে

কোনও কমিটিতেই তাঁর জায়গা হয়নি।
নিশ্চিতভাবেই মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন।
কিন্তু কখনও শিবির বদল করার কথা
ভাবেননি। তাঁর বক্তৃতায় লোকখেপানো
নেই, মিথ্যে তথ্যের বেসাতি নেই,
নোঙরা আক্রমণ নেই। তাঁর বক্তব্যের
সঙ্গে মন থেকে সবসময় একমত হতে
পারি না, কিন্তু মন থেকে তাঁর পড়াশোনা
ও বাগ্মিতাকে কুর্নিশ করতে দ্বিধা হয়নি।
এই লোকটা কাল দল বদলে ফেলতে
পারেন, কখনও এমনটা মনে হয়নি।

এমন একজন মানুষ কি সত্যিই চাইবেন
দলটা দলবদলু আয়ারাম-গয়ারামে
ভরে যাক? কখনই চাইতে পারেন না।



কিন্তু দিল্লির মাথারা যখন চাইছেন, তাঁর না চেয়ে উপায় নেই। একের পর এক তোলাবাজির খবর আসছে। মাঝে মাঝেই তিনি হুঙ্কার দিচ্ছে, বিজেপিতে এসব চলবে না। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কে শোনে তাঁর কথা? আসলে, তিনি হুঙ্কার দেওয়ায় কখনই অভ্যস্থ ছিলেন না। তাই হয়তো তাঁর হুঙ্কার নিচু তলা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না।

পালাবলের পর অতি উৎসাহী বিজেপির অভাব নেই। কেউ অ্যাকাডেমিতে গেরুয়া রঙ লাগিয়ে দিচ্ছেন। কে যাদবপুরে তাণ্ডব করছেন। দেশপ্রেমিক

বোঝাতে কেউ কেউ নানা উৎকট সব ফরমান জারি করছেন। একা শমীক কতদিকে আর সামাল দেবেন! মাঝে মাঝেই বলতে হচ্ছে, এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা মিম ঘোরাফেরা করে, কোনদিন হয়তো এই দুর্বৃত্তরা বলে বসবে, শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।

সহজ কথা, বিজেপির তৃণমূলীকরণ অনিবার্য। জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে এমপিদের যদি নিতে হয়, তাহলে কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত মেম্বাররা কী দোষ করল? তাঁরাও আগাছার মতো ঠিক ঢুকে পড়বেন। নিচু তলায় ঠিক ‘সওদা’ হয়ে যাবে। পুরসভা হোক বা পঞ্চায়েত, আদি বিজেপিরা নয়, তৃণমূল থেকে আসা লোকেরাই সংখ্যায় ভারী হবেন।

একদিকে দিল্লির কর্তারা অন্য রাজ্যে সরকার ভেঙে অভ্যস্থ। তাঁদের কাছে অন্য দল থেকে এম পি নেওয়া কোনও ‘অপরাধ’ই নয়। সেটাকে তাঁরা কৃতিত্বই মনে করেন। অন্যদিকে, নিচু তলাতেও পিল পিল করে ঢুকবে আবর্জনা। বেচারী শমীক, মাঝখানে পড়ে তাঁর স্যান্ডউইচের মতো দশা। তিনিই মধ্যম। কিন্তু তফাতে চলবেন, সে উপায়ও নেই।

একা কুণাল রক্ষা করেন...



সরল বিশ্বাস

তিনি কি বদলে গেছেন? তিনি কি রত্নাকর থেকে বাণ্মীকি হয়ে গেছেন? অন্তত তাঁর কমেণ্ট বক্সের লেখাগুলো পড়লে তেমনটাই মনে হয়। আসলে, তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। বদলে গেছে তাঁকে দেখার চোখ।

মাস ছয়েক আগেও তিনি ছিলেন নিন্দিত এক চরিত্র। কারণে-অকারণে কত গালাগাল

তাঁকে লক্ষ্য করে ধেয়ে এসেছে। তিনি যদি বলতেন, সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, তাতেও যেন রে রে করে তেড়ে আসতেন নোট্‌জেনরা। যেন মহাপাপ করেছেন। নানা বিশেষণে ভরিয়ে দেওয়া হত তাঁর কমেণ্ট বক্স। তিনিও কম যান না। তিনিও বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের লড়াইয়ে পাল্লা দিয়ে লড়ে যেতেন।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ক্ষমতায় থাকলেই মানুষকে আসল চেনা যায়। কুণাল ঘোষের ক্ষেত্রে হয়তো বিষয়টা অন্যরকম। তাঁকে আরও ভাল করে চেনা গেল তৃণমূল ক্ষমতা



হারানোর পর। তাঁকে ঘিরে রাগ, বিরক্তি সব যেন বদলে গেছে অদ্ভুত এক ভাল লাগায়।

কুণাল ঘোষ বরাবরই এক বিতর্কিত চরিত্র। বিরোধীদের জন্য যতটা বিপজ্জনক, দলের লোকেদের জন্য বোধ হয় তার থেকেও বেশি বিপজ্জনক। অনেকেই সারদার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর জেল খাটার প্রসঙ্গ টেনে এনে তাঁকে আক্রমণ করেন। আচ্ছা, তিনি কেন জেলে গিয়েছিলেন? সারদার কোনও টাকা নয়ছয়ের জন্য? তাঁকে তো সিবিআই বা ইডি গ্রেপ্তার করেনি। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য পুলিশ। কেন গ্রেপ্তার? সহজ কথা, তিনি দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। তিনি বাইরে থাকলে দলকে আরও বিব্রত হতে হত।

ছাড়া পেয়ে একটু একটু করে আবার মূলস্রোতে ফিরেছেন। মুখপত্রের দায়িত্ব নিয়ে বিপক্ষকে কড়া ট্যাকল করেছেন। বা ব্যাট হাতে উড়িয়ে দিয়েছেন গ্যালারির বাইরে।

কিন্তু কখনও কখনও সেমসাইড গোলও করে বসেছেন। নিজের পার্টি অফিসে বসে প্রেস কনফারেন্সে নিজের দলের নেতার বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন। সাসপেন্ডও হয়েছেন। কাজেই তিনি যে দারুণ ‘অনুগত’ এমনটাও বলা যাবে না।

আসল আনুগত্য কখন বোঝা যায়? যখন দল ক্ষমতায় থাকে না। একসময় তালে তাল দিয়ে যাওয়া, দস্ত বিগলিত করা অনুগত সৈনিকরা আজ অন্য শিবিরে। তাঁদের কাছে এখন তৃণমূলের চেয়ে খারাপ দল নেই। মমতার চেয়ে খারাপ নেত্রী নেই। কিন্তু এমন কঠিন সময়ে কুণাল ঘোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন, আনুগত্য কাকে বলে। মোদ্দা কথা, ‘যে দলের টিকিটে আমি জিতে এসেছি, জিতে আসার পর সেই দল ছেড়ে যাব না। যদি অভিযোগ থাকে, দলের ভেতর বলব।’ অথচ, এই সাধারণ মূল্যবোধটুকু বাকিদের আচরণে দেখা যাচ্ছে না। তাঁদের কেউ শাসকের ‘অনুগত’



বিরোধী। কেউ এনডিএ-র শরিক। কেউ জল মাপছেন।

কুণাল একাই যেন নকল বুদ্ধিগড় রক্ষা করে চলেছেন। বিধানসভায় তাঁকে সামলাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে শাসক দল। কখনও তাঁকে মার্শাল ডেকে বের করে দিতে হচ্ছে। কখনও মশা মারতে কামান দাগার মতো প্রিভিলেজ মোশন আনতে হচ্ছে। কখনও ডিম ছুঁড়ে হেনস্থা করতে হচ্ছে। কখনও রাস্তা আটকাতে হচ্ছে। কিছুতেই পেরে ওঠা যাচ্ছে না।

অথচ, তৃণমূল যদি চতুর্থবার ক্ষমতায় আসত! নিশ্চিতভাবেই ক্যাবিনেটে তাঁর জায়গা হত না। দিদিমণি চাইলেও ভাইপো দায়িত্ব নিয়ে নাম কেটে দিতেন। নবান্ন আলো করে বসে থাকতেন তাঁরাই, যাঁরা আজ গিরিগিটির মতো রঙ বদলে নিয়েছেন। জোড়া ফুলের

প্রতীকে জিতে এসে পদ্মফুলের পায়ের তলায় হামাগুড়ি খাচ্ছেন। আপাতত সাজানো বিরোধী। ভোটের আগে মুখোশ ছেড়ে সরাসরি পদ্ম পতাকা ধরে নেবেন, এমনই বলা যায়। কুণাল সেই নিষ্ফলের, হতাশের দলেই থেকে যেতেন। অন্যরা অপকর্ম করতেন, আর তিনি গাল খেয়ে যেতেন। তাঁর কমেন্ট বক্স ভরে উঠত বাছা বাছা বিশেষণে। মাঝে মাঝে সত্যিই বিস্ময় জাগত, এতকিছুর পরেও মাথা ঠান্ডা রাখেন কীভাবে?

সময় অনেক কিছু বেআব্রু করে দেয়। সময় যেমন বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, ভাইপো আসলে কতটা ভুঁইফোড় ছিলেন। সময় বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, একসময় যাঁরা মমতা ব্যানার্জিকে দেবী বলতেন, তাঁরা একে একে সব অন্য শিবিরে, তাঁর ছায়াও মাড়াচ্ছেন না। যাঁরা কদিন আগেও বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি পাড়তেন, তাঁরা কী অবলীলায় ‘সনাতনী’ সেজে বিভেদমূলক মন্তব্য করছেন। ঠিক তেমনই, সময় বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, কুণাল ঘোষ বাকিদের মতো ডিগবাজি মারার বান্দা নন। শাসকের একের পর এক বিষাক্ত বাউন্সারেও তিনি বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছেন।

রাজনীতি তাঁকে অনেককিছু দিয়েছিল। আবার কেড়েও নিয়েছিল। পথের এ যেন এক নতুন বাঁক। যে বাঁকে এসে হল তাঁর পুনর্জন্ম। কমেন্ট বক্সের ওই বদলে যাওয়া সুর যেন তারই নিদর্শন।

সিবিআই যদি ম্যাচরিপোর্ট পড়ত!

হরিশ মুখার্জি

খেলা শুরু রাত সাড়ে বারোটায়। স্বাভাবিক নিয়মেই খেলা শেষ হতে রাত আড়াইটে বাজার কথা। আপাতভাবে আমরা নব্বই মিনিট ধরি। কিন্তু মাঝে পনেরো মিনিটের বিরতি। দুই অর্ধে দু'বার ইনজুরি টাইম। সবমিলিয়ে অন্তত দু'ঘণ্টারই ব্যাপার।

বিশ্বকাপ ফাইনাল বলে কথা। মাঝে প্রায় আধঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খেলা নব্বই মিনিটে শেষ হল না। অতএব এক্সট্রা টাইম। মানে, আরও আধঘণ্টা। বিরতি, ইনজুরি টাইম। সবমিলিয়ে আরও প্রায় আধঘণ্টা। অর্থাৎ, শেষ বাঁশি বাজতে রাত পৌনে চারটে। এরপর কেউ উল্লাস করছেন, কেউ হতাশ। কেউ সারা মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মাঠে কাতারে কাতারে লোক। পুরস্কার বিতরণী শুরু হতে অন্তত আধঘণ্টা। সেখানে কাপ দেওয়া হবে সবার শেষে। তার আগে রেফারিদের পুরস্কার। সব দলের ফুটবলারদের আলাদা করে পুরস্কার। নানা



বিভাগের সেরাদের পুরস্কার। সবার শেষে কাপ দেওয়া। তারপর সেই কাপ নিয়ে আরও একপ্রস্থ সেলিব্রেশন। এই সব হতে হতে প্রায় ভোর।

খবরের কাগজের ব্যস্ততা তখন কেমন? তা নিয়ে লিখতে গেলে একটা দীর্ঘ উপন্যাস হয়ে যেতে পারে। একেকজন একেক কাজে ব্যস্ত। কেউ বিশেষজ্ঞের লেখা লিখছেন। কেউ মুড কপি লিখছেন। কেউ বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখছেন। কেউ প্রুফ দেখছেন। বিদেশ থেকে দ্রুত কেউ কপি পাঠাচ্ছেন। কেউ এডিট করছেন। কেউ হয়তো ছবি সিলেকশন করছেন। কেউ দ্রুত ছবি কারেকশন করছেন। কেউ ক্যাপশনে মন দিয়েছেন। কেউ ভাবছেন শিরোনাম নিয়ে। কেউ পাতার ডিজাইন সাজাচ্ছেন। ট্রফি দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই পেজ রিলিজ হয়ে গেল। তারপর



সেটা পিডিএফ হচ্ছে, প্রেসে যাচ্ছে। প্রেসের কর্মীরা নিজের ইনজের কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ গুনে গুনে প্যাকিং করছেন। কেউ গাড়িতে তুলছেন। কোনও গাড়ি ছুটছে শিয়ালদার দিকে, কোনওটা হাওড়ার দিকে। কোনওটা ধর্মতলার দিকে। কেউ আবার বিভিন্ন সেন্টারে যাচ্ছেন কাগজ দিতে।

মোদ্দা কথা, সাড়ে চারটের পর ট্রফি দেওয়া হল। সব রকম কপি ও ছবি সমেত, সেই কাগজ বিভিন্ন সেন্টারে পৌঁছে গেল সকাল সাড়ে পাঁচটা, ছটার মধ্যে। সেখান থেকেই হকাররা কাগজ তুলছেন। আপনার বাড়িতে সেই কাগজ পৌঁছে গেল সকাল ছটা, সাড়ে ছটা নাগাদ, বড়জোর সাতটা। কী আশ্চর্য, আপনি কাগজ হাতে নিয়ে দেখছেন, সেখানে প্রায় সবকিছুই আছে। ম্যাচের বিস্তারিত রিপোর্ট আছে, নানা রকম পরিসংখ্যান আছে, বিশেষজ্ঞদের লেখা আছে, আমেরিকা থেকে পাঠানো রিপোর্টারের কপি আছে, গোলের ছবি আছে, সেলিব্রেশনের ছবি আছে, হতাশার ছবি

আছে, ট্রফি হাতে দৌড়ের ছবি আছে। তাহলেই ভেবে দেখুন, ম্যাচ শেষ হওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যে এত হাত ঘুরে সেই কাগজ আপনার বাড়িতে চলে এল।

অথচ, সিবিআই বা ইন্ডির চার্জশিট কোর্টে জমা হতে তিন বছর, চার বছর লেগে যায়। একটা শুনানির পর পরবর্তী শুনানির জন্য দু'মাস, তিন মাসের সময় দেওয়া হয়। সমস্ত খবরের কাগজের কর্মীরা যেটা দু'ঘণ্টায় করে ফেলেন, রাষ্ট্রের এত এত ক্ষমতা ও প্রযুক্তি নিয়ে সিবিআই সেটা এক বছর লাগিয়ে দেয়। এরপর ভেবে দেখুন, সিবিআই-কে গালাগাল দেবেন নাকি খবরের কাগজকে গালাগাল দেবেন।

এখন নাকি কাগজ পড়া যায় না। সব কাগজ 'চটিচাটা'— এমনটাই তো গত কয়েক বছরে শুনে এসেছি। অথচ, যে লোকগুলো সিবিআই-কে চালনা করেন, তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যায়।

বছরের পর বছর, নানা তদন্তে সিবিআই আর ইন্ডি নামের দুটো সংস্থা যে কী সীমাহীন অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে, তা এর পরেও বুঝবেন না! এই সিবিআই-কে যাঁরা বছরের পর বছর চালাচ্ছেন, তাঁদের কবে আর লজ্জা হবে!

সিবিআই কর্তাদের বরং খবরের কাগজে কয়েক মাসের জন্য ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হোক। কীভাবে দ্রুত কাজ করতে হয়, ভাল করে শেখানো হোক।



বাড়িতে একটাও পুজো সংখ্যা নেই!

অরিন্দ্র দাস

পুজোয় যেমন ছিল নতুন জামাকাপড়, তেমনি পুজো মানে ছিল পুজো সংখ্যাও। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির ঘরেই কোনও না কোনও পুজো সংখ্যা নেওয়া হত। কোনও কোনও বাড়িতে একাধিক পুজো সংখ্যাও দেখা যেত।

কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই চেনা ছবিটা যেন বদলে গেছে। এখন পুজো সংখ্যা যেন লুপ্তপ্রায় এক প্রজাতি। অধিকাংশ ঘরেই এখন আর পুজো সংখ্যা দেখা যায় না। কারণ হিসেবে বলা হয়, এখন নাকি আর পড়ার সময় নেই। সত্যিই কি এখন আমরা সবাই বিরাট ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?

চারপাশে তাকিয়ে দেখলে এমনটা তো মনে হয় না। দিব্যি সারা দিন লোকে



ফোনে মুখ গুঁজে আছে। তরুণ প্রজন্মকে একা দায়ী করে লাভ নেই। মাঝবয়সী, এমনকী বয়স্করাও ফোনেই মগ্ন। গৃহবধূরাও কিন্তু ফাঁক পেলেই বিরাট একটা সময় কাটান ফোনের সঙ্গেই। এতই যদি ব্যস্ততা, তাহলে ফোন হাতে দিনে সাত-আট ঘণ্টা কাটানোর সময় পাওয়া যায় কীভাবে?

আসলে, আমরা পড়তে ভুলে গেছি। আসলে, আমাদের ধৈর্য তলানিতে এসে ঠেকেছে। এক পাতা পড়ার জন্য যে মনোযোগ দরকার, সেটুকুও আমাদের নেই। অথচ, এই সহজ সত্যিটা স্বীকার করার মতো সংসাহস টুকুও নেই। শুধু তাই নয়, অন্য কেউ কথা বললে,

দু মিনিট সেই কথা শোনার শিষ্টাচার টুকুও নেই। তার মাঝেই পাঁচ বার ফোন ঘাটতে হবে।

কিন্তু শুধু নিরাশা দিয়ে তো জীবন চলে না। যে সু অভ্যেস আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আমাদেরই তা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই পুজো থেকেই না হয় সেই অভিযান শুরু হোক। এবার পুজোর আগে অন্তত একটা করে পুজো সংখ্যা কিনুন। যেটা খুশি। পুরোটা পড়তে হবে না। আপনার যেসব লেখা পছন্দ, সেগুলোই পড়ুন। যদি দশটা লেখাও পড়তে পারেন, সেটাও জানবেন বিরাট প্রাপ্তি। জানবেন, আপনার ভেতর থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটাকে কিছুটা হলেও খুঁজে পেলেন।

গল্প



গানের ওপারে

সৃজন শীল

কখনও অ্যালবামে ধুলো জমে। কখনও
স্মৃতিতেও মরচে পড়ে যায়। জীবনে
কতকিছুই ফ্যাকাসে হয়ে আসে। অথচ,
শুকনো কাপড় দিয়ে একটু ঝেড়ে
দিলেই সেই ধুলোর আন্তরণ সরে যায়।
অ্যালবামের সেই ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে
আসে। কিন্তু কে ঝাড়বে সেই ধুলো?

সুস্মিতার গানের গলা ভালো। ছোটবেলা
থেকেই সবাই বলত। স্কুলের অনুষ্ঠানে
গান গাইত। পাড়ার জলসায় ডাক পড়ত।
কলেজের সরস্বতী পুজোয় সুস্মিতা গান
না গাইলে যেন অনুষ্ঠানটাই সম্পূর্ণ হত
না। রবীন্দ্রসংগীত ছিল তার সবচেয়ে
প্রিয়। তবে নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল,
অতুলপ্রসাদ, এমনকি পুরনো দিনের
আধুনিক গানও গাইত সমান যত্নে।

গানের মধ্যে কোনও একটা গণ্ডি টেনে
রাখতে তার ভালো লাগত না।

বিয়ের আগে একবার রেডিওতে অডিশন
দিতে গিয়েছিল। প্রাথমিক পরীক্ষায়
পাশও করেছিল। বাড়িতে তখন বেশ
আনন্দ। মা পাড়ার সবাইকে বলে
বেড়াতেন, মেয়ে রেডিওতে গান গাইবে।
বাবা অবশ্য খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাননি।
তাঁর ধারণা ছিল, গানবাজনা শখ হিসেবে
ভালো, কিন্তু জীবনের ভিত্তি তৈরি হয়
পড়াশোনা আর চাকরিতে। সুস্মিতাও
তখন সবে কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছে।
সামনে আরও পড়াশোনা, সংসারের নানা
পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত রেডিওতে গাওয়া
হয়নি।

বিয়ের পর গানটা ধীরে ধীরে পিছনের
সারিতে চলে গেল। স্বামী সুপ্রিয়র
গানবাজনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল না।
গান শুনতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু সুস্মিতা
নিয়মিত রেওয়াজ করবে, অনুষ্ঠানে
যাবে, নিজের একটা গানের জগৎ তৈরি
করবে—এসব নিয়ে তার কোনও উৎসাহ
ছিল না। বরং সংসারের কাজকর্ম, বাজার,
আত্মীয়স্বজন, পরে সন্তানের পড়াশোনা—
এসবের মধ্যেই সুস্মিতার দিন কেটে
যেতে লাগল।

প্রথম দিকে সুস্মিতা নিজেই ভেবেছিল,
এটাই বুঝি স্বাভাবিক। সংসার মানেই তো
অনেক কিছু ছেড়ে দেওয়া। সব ইচ্ছেকে
আঁকড়ে ধরে থাকলে কি সংসার করা
যায়? গান তো পালিয়ে যাচ্ছে না। সময়
হলে আবার গাইবে। কিন্তু সময় আর ঠিক
হয়ে ওঠেনি।

ছেলে ঋক হওয়ার পর ব্যস্ততা আরও
বাড়ল। স্কুল, টিফিন, হোমওয়ার্ক,
অসুখবিসুখ, পরীক্ষার প্রস্তুতি। তার
মধ্যেও কখনও কখনও দুপুরবেলা ঘরের
দরজা বন্ধ করে হারমোনিয়াম টেনে বসত
সুস্মিতা। একটা গান শুরু করত, তারপর
মাঝপথে থেমে যেত। বাইরে থেকে
হয়তো ঋকের ডাক আসছে, কখনও
প্রেসার কুকারের সিটি, কখনও দরজার
ঘণ্টা। সংসারের শব্দের ভিতরে নিজের
গলার শব্দটাকে আর আলাদা করে চিনতে
পারত না। একসময় হারমোনিয়ামটা
আলমারির উপর উঠে গেল। ধুলো জমল
তার ঢাকনায়।

সুস্মিতার বয়স এখন আটচল্লিশ। ঋক
কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে চাকরির চেষ্টা
করছে। বাড়িতে তার উপস্থিতি আছে,
কিন্তু আগের মতো নয়। বন্ধুবান্ধব, নিজের
কাজ, মোবাইল, ল্যাপটপ—সব মিলিয়ে
তার আলাদা একটা জগৎ তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিয়র সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্কও এখন অনেকটা অভ্যাসের মতো। প্রয়োজনীয় কথা হয়, সংসারের হিসেবনিকেশ হয়, আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া হয়। কিন্তু কোনও একসময় দু'জনের মধ্যে যে আলাদা একটা সম্পর্ক ছিল, যেখানে সামান্য কথাতেও মন ভালো হয়ে যেত, সেই জায়গাটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

অবশ্য হারিয়ে যাওয়ার কথা সুস্মিতা কাউকে বলেনি। নিজেকেও নয়। গানটা শুধু কোথাও চাপা পড়ে ছিল।

একদিন দুপুরে টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, ইউটিউবে কত মানুষ গান গাইছে! কেউ ঘরের মধ্যে বসে, কেউ বারান্দায়, কেউ আবার স্টুডিয়োয়। কারও গলায় খুব ভালো প্রশিক্ষণ, কারও গলায় ততটা নয়। তবু কত মানুষ শুনছে। কেউ প্রশংসা করছে, কেউ ভুল ধরছে, কেউ নিজের পছন্দের গান চেয়ে নিচ্ছে। কেউ আবার লিখছে, বহুদিন পরে এই গানটা শুনলাম।

সুস্মিতা বেশ কিছুক্ষণ সেই ভিডিওগুলো দেখল। তারপর নিজের অজান্তেই গুনগুন করে উঠল, ‘আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলো।’ গানটা শেষ হওয়ার আগেই থেমে

গেল। কেন থামল, সে নিজেও জানে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঋককে কথাটা বলেছিল। ঋক প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল। তারপর খুব সহজভাবে বলেছিল, মা, তুমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলতে পারো না?

কথাটা শুনে সুস্মিতা হেসেছিল। তার বয়সে আবার ইউটিউব! এত লোক গান গায়। তার গানই বা কে শুনবে? তাছাড়া, রেকর্ড করবে কীভাবে? মোবাইলে গান তুলে কি ভালো শোনায?

ঋক অবশ্য দমে যাওয়ার ছেলে নয়। সে মাকে বুঝিয়েছিল, এখন গান শোনার জন্য আর কোনও নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন নেই। ভালো লাগলে মানুষ শুনবে। আর খারাপ লাগলে শুনবে না। এর মধ্যে লজ্জার কী আছে? শেষ পর্যন্ত ঋকই একটা চ্যানেল খুলে দিল। নাম রাখল ‘গানের ওপারে’।

নামটা শুনে সুস্মিতার বেশ ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, গানেরও তো একটা ওপার আছে। যে জায়গায় পৌঁছনো যায় না, অথচ সারাজীবন তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। কত কথা সেখানে বলা হয়নি, কত অনুভূতি জমে আছে।



সুস্থিতা আপত্তি করেনি।
বরং বেশ একটা নতুন
উদ্ভেজনা তৈরি হল তার
মধ্যে। বহুদিন পর নিজের
জন্য একটা কাজ হাতে
পেল। সংসারের কাজ শেষ
করে দুপুরে একটু সময়
বের করত। ঘরের দরজা
বন্ধ করত। হারমোনিয়ামটা
নামিয়ে রাখত সামনে।
তারপর একের পর এক
গান গাইত।

গান গেয়ে যদি তার কিছুটা বলা যায়,
ক্ষতি কী?

ঝক একটা ছোট মাইক্রোফোন কিনে
আনল। মোবাইলের সামনে বসে কীভাবে
রেকর্ড করতে হয়, কীভাবে শব্দের মান
ঠিক রাখতে হয়, সব দেখিয়ে দিল।
তারপর একটা অদ্ভুত নিয়ম বেঁধে দিল।

এখনই কোনও গান আপলোড করা যাবে
না। আগে রোজ দুটো করে গান রেকর্ড
করতে হবে। এক মাসে অন্তত ষাটটা
গানের ভান্ডার তৈরি হোক। তারপর
ধীরে ধীরে একটা একটা করে ছাড়া হবে।
তাতে কোনও দিন সময় না পেলেও
সমস্যা হবে না।

প্রথম কয়েক দিন খুব
অস্বস্তি হত। নিজের গলা রেকর্ড করে
শুনলে কেমন যেন অচেনা লাগত।
কোথাও সুর ঠিক থাকছে না, কোথাও
শ্বাসের শব্দ বেশি, কোথাও আবার
উচ্চারণে জড়তা। একটা গান রেকর্ড
করার পর দশবার শুনত। তারপর আবার
গাইত। কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে
গেল।

কখনও রবীন্দ্রনাথ, কখনও নজরুল,
কখনও দ্বিজেন্দ্রলাল। কোনও দিন ‘সখী,
ভাবনা কাহারে বলে’, কোনও দিন
‘আমার সকল দুঃখের প্রদীপ’, কোনও
দিন ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’। মাঝেমধ্যে
পুরনো আধুনিক গানও গাইত। গানের

তালিকা তৈরি করতে গিয়ে বুঝল, কত গান সে ভুলে গিয়েছিল। কত গান শুধু সুরের মধ্যে নয়, তার জীবনের মধ্যেও জড়িয়ে আছে।

একটা গান গাইতে গিয়ে মনে পড়ে গেল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান। আর একটা গাইতে গিয়ে মনে পড়ল বিয়ের আগের কোনও বিকেল। কোনও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মায়ের মুখ, কোনও গানের সঙ্গে বাবার অসুস্থতার দিনগুলো। এমনকি সুপ্রিয়র সঙ্গে বিয়ের প্রথম দিকের কিছু স্মৃতিও হঠাৎ ফিরে এল। তখন সুপ্রিয় তার গান শুনত। কখনও প্রশংসা করত, কখনও বলত, গানটা আবার গাও তো।

কখন যে সেই মানুষটা বদলে গেল, সুস্মিতা জানে না। অথবা মানুষটা হয়তো বদলায়নি। বদলে গেছে সময়, বদলে গেছে তাদের সম্পর্কের প্রয়োজন। সংসার নামের একটা দীর্ঘ রাস্তা পেরোতে পেরোতে দু'জনেই হয়তো নিজেদের অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে।

এক মাসের শেষে ষাটটা গান জমে গেল। ঋক প্রথম ভিডিওটা আপলোড করল। সেখানে কোনও মানুষের মুখ নেই। শুধু স্ক্রিনজুড়ে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি। নিচে গানের নাম, শিল্পীর নাম—সুস্মিতার নাম

কোথাও নেই। কণ্ঠশিল্পী হিসেবেও নিজের পরিচয় দিতে চাইল না সে। তার যুক্তি, গানটা যদি ভালো লাগে, মানুষ শুনবে। গায়িকার মুখ দেখে গান শোনার কী দরকার?

ঋক অবশ্য বলেছিল, পরে নাম দেওয়া যাবে। কিন্তু আপাতত মায়ের ইচ্ছেতেই কাজ চলল।

চ্যানেল থেকে গান ফেসবুকেও শেয়ার করা হল। সেখানেও সুস্মিতা নিজের পরিচয় আড়ালে রাখল। নিজের ছবি দিল না, নাম দিল না, কোনও ব্যক্তিগত কথাও লিখল না। যেন সে শুধু একটা কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরের বাইরে তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

প্রথম কয়েক দিন খুব বেশি সাড়া পাওয়া গেল না। কয়েকটা ভিউ, দু-একটা লাইক। ঋক অবশ্য মাকে বুঝিয়েছিল, এসব নিয়ে ভাবলে চলবে না। নিয়মিত গান দিতে হবে। মানুষ ধীরে ধীরে চিনবে।

সুস্মিতা নিজেও বিশেষ কিছু আশা করেনি। এত দিন পরে গান গাইতে পারছে, এটাই তার কাছে অনেক। তবু কেউ একটা ভালো মন্তব্য করলে মন ভালো হয়ে যেত। কেউ লিখত, খুব সুন্দর

গেয়েছেন। কেউ লিখত, এই গানটা অনেক দিন পর শুনলাম। কেউ আবার পরের গান হিসেবে অন্য কোনও গানের অনুরোধ করত।

সেই অনুরোধগুলো পেলে সুস্মিতা যেন নতুন করে উৎসাহ পেত। গান বেছে নিত, রেওয়াজ করত, রেকর্ড করত। একটা সময় পরে বুঝতে পারল, সে শুধু গান গাইছে না, গান নিয়ে ভাবছেও। কোনও গানের কথার মানে, কোনও সুরের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বিষাদ, কোনও লাইনের সূক্ষ্ম ওঠানামা—এসব নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

অনেক দিন পর তার নিজের একটা জগৎ তৈরি হয়েছে। সেই জগতে কেউ তাকে কারও স্ত্রী বলে চেনে না, কারও মা বলে চেনে না। কেউ জানে না, সে কখন বাজারে যায়, কখন রান্না করে, কখন শাশুড়ির ওষুধের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে তার পরিচয় শুধু তার গলা। এই পরিচয়টাই তাকে একটু একটু করে বদলে দিতে লাগল।

তারপর একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ফেসবুক মেসেঞ্জারে দীর্ঘ একটা বার্তা এল। পাঠিয়েছে সুপ্রিয়। একই বাড়িতে থাকে, প্রতিদিন দেখা হয়,

প্রয়োজনীয় কথা হয়। অথচ এত দিন পর সে ফেসবুকে একটা বার্তা পাঠিয়েছে। সুস্মিতা প্রথমে ভেবেছিল, হয়তো কোনও লিংক বা অফিসের কাজে কিছু জানতে চাইছে।

বার্তাটা খুলে পড়ল। সুপ্রিয় লিখেছে, সে গানের খুব অনুরাগী। অনেক দিন ধরে ‘গানের ওপারে’ শুনছে। এই চ্যানেলের গায়িকার কণ্ঠে একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। গান শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন খুব কাছের কেউ কথা বলছে। এমন গলায় গান শুনলে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে। গায়িকার গলায় একটা চুম্বন করতে ইচ্ছে করে।

সুস্মিতা বার্তাটা দ্বিতীয়বার পড়ল। তারপর তৃতীয়বার। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে ফেলল।

কী আশ্চর্য! যে মানুষটা এত বছর তার গানকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি, সেই মানুষটাই আজ তার কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়তে চাইছে। অথচ সে জানেই না, যার গলায় চুম্বন করতে ইচ্ছে করছে, সেই মানুষটা প্রতিদিন তার সামনেই ঘুরে বেড়ায়। একই টেবিলে বসে চা খায়। একই ঘরে রাতে ঘুমোয়।

সুস্মিতার মনে হল, সুপ্রিয়র চোখের
সামনে একটা ছোট্ট গানের চারাগাছ এত
দিন ধরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে একবারও
জল ঢালেনি। গাছটার দিকে তাকিয়ে
দেখেনি। অথচ আজ সেই গাছের ফুলের
গন্ধ অন্য কোথাও পৌঁছেছে বলে তার
এত মুগ্ধতা!

রাগ হল না। অভিমানও নয়। বরং একটা
অদ্ভুত কৌতুকবোধ তাকে গ্রাস করল।

যে মানুষটা এত দিন তার গানের দিকে
তাকায়নি, সে আজ গানের গায়িকাকে
খুঁজছে। যে কণ্ঠস্বরকে সে সংসারের
কাজের ফাঁকে হারিয়ে যেতে দিয়েছে,
সেই কণ্ঠস্বরই আজ তাকে টানছে।

সুস্মিতা কোনও উত্তর দিল না।

পরের দিন সকালে সে অনেকক্ষণ ধরে
একটা গান নিয়ে বসে রইল। গানটা
আগেও গেয়েছে। কিন্তু আজ গাইতে
গিয়ে কথাগুলো অন্য রকম মনে হল।

‘তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই
ক্ষণে ক্ষণ।’

গানটা রেকর্ড করার পর সে নিজেই
বারবার শুনল। কোথাও বাড়তি আবেগ

নেই, কোথাও জোর করে বিষাদ তৈরি
করার চেষ্টা নেই। শুধু একটা শান্ত স্বর,
যেন বহু দিনের কোনও কথা অবশেষে
নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে।

ঝক গানটা শুনে খুব খুশি হল। বলল,
এটা ভালো হয়েছে, মা। আজই
আপলোড করি?

সুস্মিতা মাথা নাড়ল।

সেই দিনই গানটা আপলোড হল।
স্ক্রিনজুড়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি। চ্যানেলের
নাম ‘গানের ওপারে’। গায়িকার পরিচয়
অজানা।

সন্ধ্যার পর সুপ্রিয় আবার মেসেজ করল।
লিখল, আজকের গানটা অসাধারণ।
এত আবেগ, এত গভীরতা—মনে হয়,
গায়িকা নিজের জীবনের কথা গাইছেন।

সুস্মিতা মেসেজটা পড়ে ফোনটা নামিয়ে
রাখল।

তারপর রান্নাঘরে গেল। সুপ্রিয় টেবিলে
বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। চা দিতে
গিয়ে সুস্মিতা একবার তার দিকে
তাকাল। মানুষটাকে খুব চেনা মনে হল,
আবার কোথাও যেন অচেনাও। এত বছর



একসঙ্গে থেকেও দু'জনের মধ্যে কতটা
দূরত্ব জমতে পারে, সেটা আজ নতুন করে
বুঝতে পারল সে।

সুপ্রিয় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আবার
ফোনে মন দিল। হয়তো 'গানের
ওপারে'র নতুন ভিডিওটা খুলেছে।
হয়তো গায়িকার গলা শুনছে। সুস্মিতা
কিছু জিপ্সোস করল না।

তার মনে হল, এত দিন সে হয়তো
সুপ্রিয়র কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি
চেয়েছিল। চেয়েছিল, একদিন সে বলুক,
তোমার গানটা ভালো হয়েছে। আরও
গাও। তোমার গান শুনতে ভালো লাগে।

আজ সেই স্বীকৃতি এসেছে।
কিন্তু এসেছে অন্য এক
গায়িকার জন্য। যে গায়িকার
মুখ নেই, নাম নেই, পরিচয়
নেই।

সুস্মিতা কি তাহলে হেরে
গেল?

প্রশ্নটা মনে আসতেই নিজেই
হেসে ফেলল।

না, সে হারেনি। কারণ এত দিন
পর সে আবার গান গাইছে।

নিজের ইচ্ছেতে গাইছে। কেউ শুনুক
বা না শুনুক, কেউ প্রশংসা করুক বা না
করুক, গানটা এখন তার জীবনের অংশ।
সুপ্রিয়র মুগ্ধতা তার কাছে মজার একটা
ঘটনা মাত্র। তার চেয়ে অনেক বড় কথা,
সে আবার নিজের ভিতরের মানুষটাকে
খুঁজে পেয়েছে।

পরদিন সকালে রেওয়াজ করতে
বসে সুস্মিতা দরজাটা বন্ধ করল না।
হারমোনিয়ামের সামনে বসে গাইতে
শুরু করল। তার গলা ভেসে গেল ঘরের
বাইরে, বারান্দা পেরিয়ে, সকালের
আলোয়।

সুপ্রিয় তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

গান শেষ করে সুস্মিতা জানলার কাছে
গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে রোদ উঠেছে।
গাছের পাতায় হাওয়া লাগছে। দূরে
কোনও বাড়িতে একটা বাচ্চা পড়া মুখস্থ
করছে। সব কিছুই আগের মতো, অথচ
তার নিজের ভিতরে কিছু একটা বদলে
গেছে।

এখন আর গান গাওয়ার জন্য কারও
অনুমতির দরকার হয় না। কারও
প্রশংসার অপেক্ষায় থাকতে হয় না।
নিজের কণ্ঠস্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার
জন্য অন্য কাউকে চিনে নেওয়ারও
প্রয়োজন নেই।

‘গানের ওপারে’ নামটা সে এমনি এমনি
রাখেনি।

গানের ওপারে হয়তো আর একটা মানুষ
থাকে। হয়তো থাকে না। হয়তো থাকে
নিজেরই আর একটা রূপ, যাকে এত
দিন চিনতে পারেনি। সংসারের নানা
পরিচয়ের আড়ালে যে মানুষটা চাপা
পড়ে গিয়েছিল, গান তাকে আবার
সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

সুস্মিতা জানে না, সুপ্রিয় কোনও দিন

তার পরিচয় জানতে পারবে কি না।
জানলেও কী হবে, সেটাও জানে না।
হয়তো একদিন সব কথা বলে দেবে।
হয়তো বলবে না। এই মুহূর্তে কোনও
সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাড়া তার নেই।

শুধু একটা ব্যাপার সে বুঝেছে।

ভালোবাসা সব সময় কাউকে পাওয়ার
নাম নয়। কখনও কখনও ভালোবাসা
নিজের হারিয়ে যাওয়া অংশটুকুকে ফিরে
পাওয়ার নামও।

আর সেই ফিরে পাওয়ার পথটা যদি
গানের ভিতর দিয়ে যায়, তবে সেই
পথের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে
আর আগের মতো একা মনে হয় না।

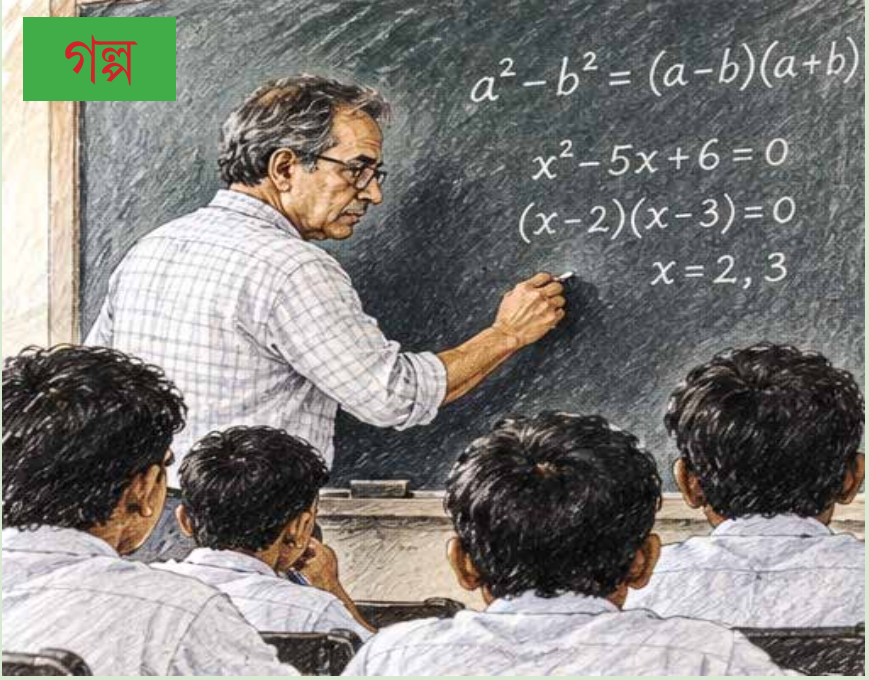
সুস্মিতা আবার হারমোনিয়াম টেনে
নিল।

এ বার সে গাইবে নিজের জন্য।

গানের ওপারে কে আছে, তা জানার
জন্য নয়।

নিজের ভিতরে যে মানুষটা এত
দিন অপেক্ষা করে ছিল, তার কাছে
পৌঁছানোর জন্য।

গল্প



নতুন অঙ্কের খোঁজে

ত্রিদিব দেবনাথ

শূন্য মানে গোপলা। শূন্য মানেই তাচ্ছিল্য।
কিন্তু এই ভারতেই শূন্যের আবিষ্কার।
আপাতভাবে শূন্য হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু
যার পাশে সে বসবে, তার মূল্য একলাফে
অনেকটা বেড়ে যাবে। আর কেউ বুঝুক
না বুঝুক, অঙ্কের শিক্ষক জয়ন্তবাবু বেশ
ভালই বোঝেন। তিনি মেতে গেলেন

শূন্যের খেলায়। বলা ভাল, শূন্য থেকে
শুরুর খেলায়।

জয়ন্তবাবুর বয়স পঁয়ষাট। জী সূচদ্রার
বাষাট। তাঁদের এক ছেলে, এক মেয়ে।
দু'জনেই বাইরে থাকে। ছেলে ভুবনেশ্বরে,
মেয়ে কলকাতায়। নিজেদের সংসার নিয়ে
তারা ব্যস্ত। ফোনে কথা হয়, মাঝেমাঝে
ভিডিও কল। পুজোয় কিংবা শীতের ছুটিতে
দু-এক দিনের জন্য বাড়িতে আসে। তখন

বাড়িটা একটু সরগরম হয়। তারপর আবার
যে কে সেই।

জয়ন্তবাবু অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। প্রায়
পঁয়ত্রিশ বছর একটি স্কুলে পড়িয়েছেন।
বছর পাঁচেক হল অবসর নিয়েছেন। চাকরি
থেকে অবসর নেওয়ার দিন সহকর্মীরা
তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়েছিলেন, একটা
ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা
অনেকে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম
করেছিল। কেউ কেউ জড়িয়ে ধরে কেঁদেও
ফেলেছিল। সেদিন জয়ন্তবাবুর বুকের
ভিতরটা কেমন ভরে গিয়েছিল। মনে
হয়েছিল, জীবনে কিছু একটা তো করতে
পেরেছেন। কত ছেলেমেয়ে তাঁর হাত ধরে
বড় হয়েছে। কতজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,
অধ্যাপক হয়েছে। কেউ বিদেশে থাকে,
কেউ ব্যবসা করে, কেউ আবার তাঁর
মতোই স্কুলে পড়ায়।

সেদিন বাড়ি ফিরে সূচন্দ্রাকে বলেছিলেন,
এ বার একটু নিজের মতো করে বাঁচবেন।
এত দিন স্কুল, খাতা দেখা, পরীক্ষার
দায়িত্ব, মিটিং, ছাত্রদের অভিভাবকদের
ফোন—কত কী! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত
একটা ব্যস্ততা ছিল। এ বার আর কোনও
তাড়া নেই। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে
খেতে খবরের কাগজ পড়বেন। দুপুরে
একটু বিশ্রাম। বিকেলে হাঁটতে বেরোবেন।
মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে যাবেন।
পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবেন।

সূচন্দ্রা হেসেছিলেন। বলেছিলেন, এত দিন
সংসারের জন্য সময় দিতে পারিনি, এ
বার অন্তত একটু সময় পাবে।

জয়ন্তবাবুও হেসেছিলেন।

কিন্তু অবসর জীবনের প্রথম কয়েক মাস
কাটতে না কাটতেই তাঁর হাসি মিলিয়ে
গেল।

প্রথম প্রথম ভালোই লাগছিল। সকালে
তাড়াতাড়ি ওঠার কোনও বাধ্যবাধকতা
নেই। স্কুলে যাওয়ার তাড়া নেই। বাজার
থেকে ফিরে স্নান সেরে আরাম করে
ভাত খাওয়া যায়। দুপুরে ইচ্ছে হলে ঘুম।
কোনও দিন বিকেলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা
করতে যাওয়া। মনে হয়েছিল, এ তো বেশ
ভালো।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলেন, এতটা
অবসর তিনি চাননি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কী করবেন,
ভেবে পান না। খবরের কাগজের সব খবর
পড়া হয়ে যায়। চায়ের কাপ শেষ হয়ে
যায়। টেলিভিশনে খবর দেখেন, তারপর
একই খবর বারবার শুনতে শুনতে বিরক্ত
হয়ে ওঠেন। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর
বিছানায় শুয়ে থাকেন। ঘুম আসে না।
উঠে বসেন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে

থাকেন। সময় যেন কাটতেই চায় না।

আগে এই সময়টায় কত কাজ থাকত! স্কুলে যাওয়ার আগে পড়া তৈরি করা, ক্লাসে ঢোকার আগে অঙ্কগুলো আর একবার দেখে নেওয়া, কোনও ছাত্রের খাতায় ভুল পেলে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা। স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে টিউশন। রাতে আবার পরের দিনের পড়া তৈরি করা। পরীক্ষার সময় তো কথাই নেই। একটার পর একটা খাতা। চোখ জ্বালা করত, কোমর ব্যথা করত। তবু কাজের মধ্যে একটা আনন্দ ছিল। পরের দিন ক্লাসে গিয়ে কোনও ছাত্র যদি বলত, স্যার, অঙ্কটা বুঝেছি, তখন সব ক্লাস্টি দূর হয়ে যেত।

এখন কেউ অঙ্ক বুঝতে আসে না। কেউ খাতা নিয়ে বসে না। কেউ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে না, স্যার, একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেবেন? এই না-থাকাটাই ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে উঠল।

সূচন্দ্রা অবশ্য নিজের মতো করে সংসার সামলাতেন। গাছের যত্ন নিতেন, পুরনো শাড়ি গুছিয়ে রাখতেন, মাঝেমধ্যে আত্মীয়দের ফোন করতেন। জয়ন্তবাবুকে নিয়ে বাজারে যাওয়ার কথাও বলতেন। কিন্তু সব কিছুতেই জয়ন্তবাবুর মন বসত না। বাজারে গেলে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চাইতেন। বিকেলে হাটতে বেরিয়ে

পরিচিত কাউকে পেলে দু-চারটে কথা বলতেন, তারপর বাড়ি ফিরে আসতেন।

একসময় মোবাইল ফোনে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ছেলে একটা স্মার্টফোন কিনে দিয়েছিল। ফেসবুক খুলে দিয়েছিল, ইউটিউব দেখিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিকে বেশ মজা লাগত। পুরনো ছাত্রদের কাউকে কাউকে খুঁজে পেলেন। কারও বিয়ের ছবি, কারও ছেলের জন্মদিন, কারও বিদেশ ভ্রমণের ছবি। ভালোই লাগত। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সেই ভালো লাগাও চলে গেল।

সারাক্ষণ একই জিনিস। কে কোথায় খেতে গেল, কে কী জামা পরল, কে কত বড় বাড়ি কিনল, কে কোন পুরস্কার পেল। কারও ছবি দেখে মনে হয়, জীবনটা যেন শুধু অন্যদের দেখানোর জন্যই। কেউ একটা ফুলের ছবি তুলে লিখছে, জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করুন। কেউ একটা কাপ চায়ের ছবি দিয়ে লিখছে, নিজের জন্য সময় বের করুন। জয়ন্তবাবুর মনে হত, এরা কি সত্যিই এত আনন্দে আছে? নাকি আনন্দের ছবিটা দেখানোর জন্যই এত আয়োজন?

একদিন বিরক্ত হয়ে ফোনটা টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, সারাজীবন ছেলেমেয়েদের অঙ্কের হিসেব শিখিয়েছেন। এখন নিজেই যেন জীবনের



হিসেবটা হারিয়ে ফেলেছেন।

বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পেনশনের টাকা হিসেব করে দেখলেন, খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। দু-একবার ঘুরে এলে ভালো লাগবে ঠিকই, কিন্তু তাতে বাকি দিনগুলো তো আর ভরে উঠবে না। বন্ধুরাও কমে এসেছে। কেউ অসুস্থ, কেউ ছেলের কাছে চলে গেছেন, কেউ আবার নিজের সংসারের ঝামেলায় আটকে আছেন।

আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। আগে তাঁরা নেমন্তন্ন করতেন, বারবার যেতে বলতেন। এখন ফোন করে কথা হয়, কিন্তু আগের মতো টান নেই। জয়ন্তবাবু জানতেন, কেউ তাঁকে অপছন্দ করেন না। তবু কোথাও যেন একটা অস্বস্তি কাজ করত। হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে যদি তাঁরা ভাবেন, এই বুড়ো

মানুষটা সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে, তাই সময় কাটাতে চলে এসেছে! কারও সংসারে অকারণে বাড়তি মানুষ হয়ে থাকার ইচ্ছে তাঁর ছিল না।

এই ভাবনা থেকেই একদিন পুরনো স্কুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্কুলটা বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। যে রাস্তায় প্রতিদিন কত বছর হেঁটেছেন, সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গেটটা নতুন হয়েছে। দেওয়ালে নতুন রং। মাঠের এক পাশে সাইকেল রাখা। ক্লাসের ভিতর থেকে ছাত্রদের পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই আওয়াজ শুনে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল।

তিনি সরাসরি প্রধান শিক্ষকের ঘরে গেলেন। বর্তমান প্রধান শিক্ষক তাঁর ছাত্র ছিলেন না। বয়সে বেশ ছোট। ভদ্রভাবে বসতে বললেন, চা খাওয়ালেন। জয়ন্তবাবু নিজের প্রস্তাবটা জানালেন। অবসর নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পড়ানোর ইচ্ছেটা এখনও আছে। সপ্তাহে দু-তিন দিন কয়েকটা ক্লাস নিতে পারেন। কোনও পারিশ্রমিক লাগবে না। শুধু ছাত্রদের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চান। বিশেষ করে যাদের অঙ্কে দুর্বলতা আছে, তাদের নিয়ে কাজ করতে চান।

কথা বলতে বলতে তাঁর নিজেরই মনে

হচ্ছিল, প্রস্তাবটা খুব খারাপ নয়। স্কুলেরও লাভ, তাঁরও ভালো লাগবে। পুরনো শিক্ষক, অভিজ্ঞতা আছে, কোনও টাকার দাবি নেই।

প্রধান শিক্ষক মন দিয়ে শুনলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, স্কুলে এখন অনেক নিয়মকানুন। বাইরের কাউকে নিয়মিত ক্লাসে নেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া শিক্ষকদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এসে ক্লাস নিলে কারও কারও অস্বস্তি হতে পারে। ছাত্ররাও নতুন পদ্ধতির সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারবে, বলা যায় না। তার উপর সিলেবাসও অনেক বদলে গেছে।

জয়ন্তবাবু বুঝতে পারছিলেন, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু শেষ চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, তিনি তো কোনও দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। শুধু দু-একটা ক্লাস। প্রধান শিক্ষক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাননি।

বাড়ি ফেরার পথে জয়ন্তবাবুর মনে হচ্ছিল, স্কুলটা যেন হঠাৎ খুব অচেনা হয়ে গেছে। যে জায়গাটাকে তিনি নিজের জীবনের বড় অংশ বলে মনে করতেন, সেখানে আজ তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। হয়তো এটাই নিয়ম। সময় বদলায়, মানুষ বদলায়। পুরনো দিনের অভিজ্ঞতা সব সময় নতুন দিনের কাজে লাগে না। কথাগুলো তিনি

নিজেকেই বোঝালেন। কিন্তু মন মানল না।

বাড়িতে ফিরে সূচন্দ্রাকে কিছু বললেন না। শুধু দুপুরের খাবার খেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে রইলেন।

সেদিন রাতেই নতুন একটা ভাবনা মাথায় এল। স্কুলে যদি জায়গা না হয়, নিজের বাড়িতেই পড়াবেন। একটা ছোট ব্যাচ শুরু করবেন। আশপাশে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে। অঙ্কে দুর্বল ছেলেমেয়ের অভাব নেই। তিনি তো এত বছর পড়িয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে দোষ কোথায়?

কিন্তু পরের মুহূর্তেই দ্বিধা। এখন এলাকায় যারা অঙ্ক পড়ায়, তাদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। কেউ কেউ বেশ ভালো নাম করেছে। কারও বাড়িতে দশ-বারোটা ব্যাচ চলে। কেউ আবার বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এই বয়সে এসে তিনি যদি টিউশনি শুরু করেন, তারা কী ভাবে? তাদের ছাত্রছাত্রীরা যদি তাঁর কাছে চলে আসে? এটা কি ঠিক হবে?

তিনি কি নিজের পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবেন? ভাবনাটা তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

একদিন পুরনো এক ছাত্রের সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছিল। ছেলেটি এখন নিজেই



শিক্ষক। জয়ন্তবাবুকে দেখে খুব খুশি হয়েছিল। প্রণাম করে খবর নিয়েছিল। বলেছিল, স্যার, আপনার কাছে পড়েই তো অঙ্কে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। সেই কথাটা শুনে জয়ন্তবাবুর ভালো লেগেছিল। কিন্তু এখন সেই ছাত্রেরই টিউশনি রয়েছে। জয়ন্তবাবু যদি পড়ানো শুরু করেন, তবে কি সে ভাববে, তাঁর ছাত্রদের ভাগ বসাতে এসেছেন?

কয়েক দিন এই নিয়ে ভাবলেন। তারপর একদিন নিজের মনেই বুঝলেন, তিনি আসলে অন্যদের কথা ভেবে নিজের

ইচ্ছেটাকে আটকে রাখছেন। কেউ কী ভাববে, সেই ভয়েই কি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন? তিনি কি কারও ব্যবসা কেড়ে নিতে চাইছেন? না। তিনি পড়াতে চান। নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চান। ছাত্রছাত্রীরা যদি তাঁর কাছে আসে, তবে আসবে। না এলে আসবে না। কিন্তু চেষ্টা করার আগেই হেরে যাবেন কেন?

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর তাঁর ভিতরে একটু সাহস ফিরে এল। একটা সাদা কাগজে নিজের নাম, ফোন নম্বর আর পড়ানোর বিষয় লিখে ফেললেন। অঙ্ক — পঞ্চম

থেকে দশম শ্রেণি। বিশেষ যত্নে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হবে। তারপর এক পরিচিত ছাপাখানায় গিয়ে কয়েকটা ফ্লেক্স ছাপানোর অর্ডার দিলেন। প্রথমে ছোট পোস্টার করার কথা ভেবেছিলেন। পরে মনে হল, ফ্লেক্স হলে দূর থেকে চোখে পড়বে।

ফ্লেক্সগুলো হাতে পাওয়ার দিন সকালে তাঁর ঘুম ভাঙল বেশ তাড়াতাড়ি। জানলার বাইরে তখনও রোদ ওঠেনি। সুচন্দ্রা চা করতে গিয়েছিলেন। জয়ন্তবাবু ফ্লেক্সগুলো একবার খুলে দেখলেন। নিজের নামটা দেখে অদ্ভুত লাগছিল। এত বছর স্কুলের নোটিসে, পরীক্ষার দায়িত্বের তালিকায়, রেজাল্টের খাতায় কতবার নাম দেখেছেন। কিন্তু এভাবে নিজের নাম কখনও দেখেননি। মনে হল, নতুন করে শুরু করছেন।

সুচন্দ্রা প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন। তারপর আর কিছু বলেননি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্কুলের সামনে টাঙাবে নাকি?

জয়ন্তবাবু মাথা নেড়েছিলেন।

তিনি জানতেন, স্কুলের সামনে ফ্লেক্স টাঙানো খুব সহজ হবে না। অনুমতি লাগতে পারে। তবু প্রথম ফ্লেক্সটা সেখানেই

টাঙাতে চান। যে জায়গায় এত বছর তাঁর পরিচয় তৈরি হয়েছে, সেই জায়গার সামনেই আবার দাঁড়াতে চান। কাউকে কিছু প্রমাণ করার জন্য নয়, নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য—তিনি এখনও পারেন।

সকাল ন’টার দিকে একটা ব্যাগে ফ্লেক্স, দড়ি আর কয়েকটা পেরেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় তখন স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে। কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে। তাদের দেখে নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ল। একসময় তিনিও তো এভাবেই স্কুলে যেতেন। তারপর কত বছর এই ছেলেমেয়েদেরই পড়িয়েছেন।

স্কুলের গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রার্থনা শুরু হয়েছে। একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠে গান ভেসে আসছে। গেটের পাশে পুরনো বটগাছটা এখনও আছে। শুধু গাছটার ডালপালা আরও ছড়িয়ে পড়েছে।

জয়ন্তবাবু ব্যাগটা নামিয়ে রাখলেন। ফ্লেক্সটা বের করে মেলে ধরলেন। নিজের নাম, ফোন নম্বর, পড়ানোর কথা—সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, কাজটা কি খুব তাড়াহুড়া হয়ে গেল? কেউ দেখে

হাসবে না তো? পুরনো ছাত্ররা যদি দেখে?
প্রধান শিক্ষক যদি আপত্তি করেন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর ফ্লেক্সটা ভাঁজ করে আবার ব্যাগে
চুকিয়ে ফেললেন।

সেদিন আর টাঙানো হল না।

বাড়ি ফিরে তিনি কাউকে কিছু বললেন
না। দুপুরে খাওয়ার পর ঘরে বসে ফ্লেক্সটা
আবার বের করলেন। নামটা দেখলেন।
তারপর নিজের হাতের লেখা একটা
পুরনো খাতা খুললেন। বহু বছর আগে
ক্লাসে পড়ানোর জন্য অঙ্কের কিছু নিয়ম
লিখে রেখেছিলেন। পাতাগুলো হলুদ
হয়ে গেছে। একটা পাতার উপরে লেখা,
‘অঙ্কে ভয় পেলে অঙ্ক কখনও বন্ধু হবে
না।’

লাইনটা পড়ে তাঁর মনে হল, কথটা শুধু
ছাত্রদের জন্য নয়। তাঁর নিজের জন্যও।

পরদিন সকালে আবার বেরোলেন।

এ বার স্কুলের সামনে পৌঁছে আর বেশি
ভাবলেন না। রাস্তার পাশে যে জায়গায়
কয়েকটি বিজ্ঞাপন ঝুলছে, সেখানে

ফ্লেক্সটা টাঙানোর ব্যবস্থা করলেন। হাত
একটু কাঁপছিল। দড়ির গিঁট বাঁধতে
সময় লাগল। একবার খুলে যাচ্ছিল,
আবার বাঁধলেন। পাশ দিয়ে কয়েকজন
ছাত্র যাচ্ছিল। তারা একটু দাঁড়িয়ে
দেখল। একজন ফ্লেক্সের দিকে তাকিয়ে
অন্যজনকে কিছু বলল। তারপর হেসে
চলে গেল।

জয়ন্তাবুর বুকের ভিতরটা ধক করে
উঠেছিল। কিন্তু তিনি মুখ তুললেন না।
নিজের কাজ শেষ করলেন। তারপর
একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে ফ্লেক্সটার দিকে
তাকালেন।

সকালের রোদ এসে পড়েছে তাঁর নামের
উপর।

হয়তো কেউ ফোন করবে, হয়তো করবে
না। হয়তো দু-একজন ছাত্র আসবে,
হয়তো প্রথম সপ্তাহে কেউই আসবে
না। এসবের কোনও নিশ্চয়তা নেই।
পেনশনের টাকায় সংসার চলছে, তাই
এই পড়ানো থেকে টাকা না এলেও তাঁর
খুব বড় সমস্যা হবে না। কিন্তু টাকার
জন্যই তো তিনি পড়াতে চাইছেন না।
তিনি চাইছেন, দিনের শেষে যেন মনে
হয়, আজকের দিনটা কাজে লাগল। আজ
কাউকে কিছু শেখাতে পারলেন। কোনও

ছাত্রের চোখে অঙ্কের ভয়টা একটু কমাতে
পারলেন।

স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল।

গেট দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভিতরে ঢুকছে।
তাদের মধ্যে একজন ছেলে ফ্লেস্কটার
সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যাগটা কাঁধ থেকে
নামিয়ে ফোন নম্বরটা মোবাইলে তুলে
নিল। তারপর দৌড়ে স্কুলের ভিতরে চলে
গেল।

জয়ন্তবাবু সেটা লক্ষ্য করেছিলেন।

তিনি জানতেন না, ছেলেটি সত্যিই ফোন
করবে কি না। হয়তো শুধু কৌতূহলবশত
নম্বরটা তুলে নিয়েছে। তবু অনেক দিন
পর তাঁর মনে একটা ছোট্ট আনন্দ হল।

বাড়ি ফেরার পথে তিনি আর তাড়াহুড়ো
করলেন না। চেনা রাস্তায় ধীরে ধীরে
হাঁটলেন। একটা চায়ের দোকানের সামনে
দাঁড়িয়ে চা খেলেন। তারপর বাড়ি ফিরে
টেবিলের উপর খাতা-কলম সাজিয়ে
রাখলেন।

বহু দিন পর তিনি পরের দিনের জন্য
প্রস্তুতি নিতে বসলেন।

কোন ক্লাসের ছাত্র এলে কী পড়াবেন,
কোথা থেকে শুরু করবেন, কোন
অঙ্কগুলো দিয়ে ছাত্রের দুর্বলতা বোঝা
যাবে—এসব ভাবতে ভাবতে দুপুর
গড়িয়ে গেল। সুচন্দ্রা ঘরে এসে দেখলেন,
জয়ন্তবাবু খাতায় অঙ্ক করছেন। মুখে
একটা অন্যরকম মনোযোগ।

তিনি কিছু বললেন না। শুধু চুপচাপ এক
কাপ চা রেখে গেলেন টেবিলে।

জয়ন্তবাবু মাথা তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে
একটু হাসলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মোবাইলটা বেজে
উঠল। অচেনা নম্বর। জয়ন্তবাবু ফোন
ধরলেন। ওপার থেকে এক ভদ্রলোক
জানালেন, তাঁর ছেলে দশম শ্রেণিতে
পড়ে। অঙ্কে খুব ভয় পায়। স্কুলের সামনে
ফ্লেস্ক দেখে নম্বর পেয়েছেন। একবার
জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

ফোনটা রেখে জয়ন্তবাবু বেশ কিছুক্ষণ চুপ
করে বসে রইলেন। তারপর খাতাটা টেনে
নিলেন নিজের দিকে।

সুচন্দ্রা পাশের ঘর থেকে তাঁর মুখটা
দেখতে পাচ্ছিলেন। এই মুখটা তিনি বহু
বছর দেখেছেন। পরীক্ষার আগে নতুন

প্রশ্ন তৈরি করার সময়, দুর্বল ছাত্রের
খাতা দেখার সময়, কোনও অঙ্কের নতুন
সমাধান খুঁজে পাওয়ার সময়—এই একই
মনোযোগ, এই একই আগ্রহ।

বাইরে সন্ধে নেমেছে। রাস্তার আলো
জ্বলে উঠেছে। দূরে কোথাও স্কুল ছুটির
পর ছেলেমেয়েদের চিৎকার শোনা
যাচ্ছে।

জয়ন্তাবু খাতার প্রথম পাতায় লিখলেন,
‘প্রথম ক্লাস’।

তারপর নিচে একটা সহজ অঙ্ক লিখলেন।

অঙ্কটা খুব কঠিন নয়। কিন্তু তিনি জানেন,
কোনও কোনও ছাত্রের কাছে সহজ অঙ্কও
পাহাড়ের মতো মনে হয়। সেই পাহাড়ের
সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছেলেকে
হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে,
সেটাও কম কথা নয়।

অবসর নেওয়ার পর পাঁচ বছর কেটে
গেছে। বয়স পঁয়ষাট। জীবনের অনেকটা
পথ পেরিয়ে এসেছেন তিনি। এখন আর
আগের মতো টানা কয়েক ঘণ্টা ক্লাস
নিতে পারবেন না। চোখে চশমা লাগে,
হাঁটতে গেলে হাঁটুতে ব্যথা হয়। নতুন
সিলেবাসের সঙ্গে আবার পরিচিত হতে

হবে। অনেক কিছুই নতুন করে শিখতে
হবে তাঁকে।

তবু তিনি জানেন, একটা জিনিস এখনও
তাঁর কাছে আছে।

কাউকে বোঝানোর ধৈর্য।

কোনও ছাত্র ভুল করলে তাকে আর
একবার বুঝিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে।

আর অঙ্কের একটা কঠিন সমস্যা সমাধান
হয়ে গেলে ছাত্রের মুখে যে আনন্দ ফুটে
ওঠে, সেই আনন্দ দেখার অপেক্ষা।

জয়ন্তাবু কলমটা হাতে তুলে নিলেন।
জানলার বাইরে অঙ্ককার আরও ঘন
হয়েছে। টেবিলের আলোয় খাতার সাদা
পাতাটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

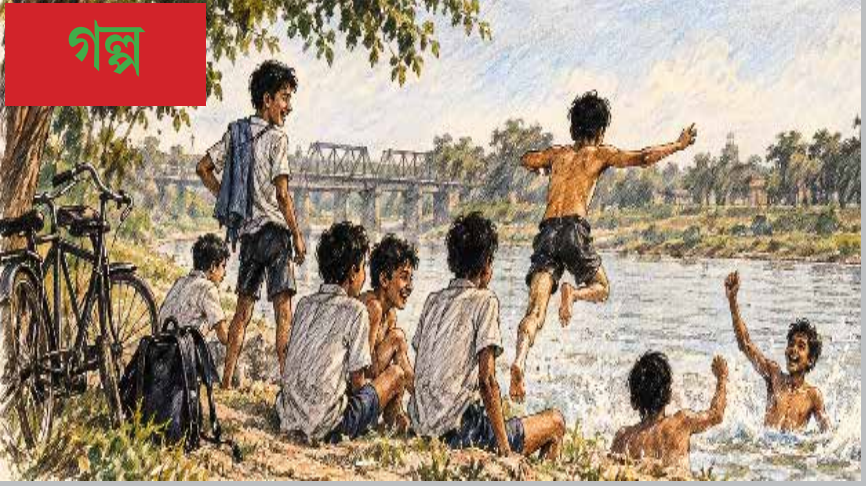
তিনি অঙ্কটা আবার করলেন।

এ বার কোনও ছাত্রের জন্য নয়।

নিজের জন্য।

কারণ, জীবনের সব হিসেব অবসরের
দিন শেষ হয়ে যায় না। কিছু হিসেব
তখনই নতুন করে শুরু হয়।

গল্প



ফেরার টিকিট

সুপ্রিয় চক্রবর্তী

মহালয়ার পর থেকেই বেঙ্গালুরুর আকাশটা কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল অর্পণের। আসলে আকাশের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেই একই নীল, একই রকম সাদা মেঘের আনাগোনা, বিকেলের দিকে হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি। অফিস থেকে ফেরার পথে রাস্তায় যানজট, বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে ভেসে আসা পেট্রোলের গন্ধ, ফুটপাথের ধারে ছোট ছোট দোকান। সবই তো আগের মতো। তবু কোথাও একটা কিছু যেন ঠিক মিলছিল না।

বছর ছাব্বিশের অর্পণ মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়তে এসেছিল বেঙ্গালুরুতে। পড়াশোনা শেষ করে এখানেই চাকরি। দেখতে দেখতে প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। প্রথম প্রথম শহরটাকে অচেনা লাগত। ভাষা বুঝতে অসুবিধে হত, রাস্তা চিনতে পারত না, অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে সন্কে নেমে আসত। তখন মনে হত, কবে যে বাড়ি ফিরবে! কবে আবার সেই চেনা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবে!

এখন অবশ্য বেঙ্গালুরুও অনেকটা চেনা

হয়ে গেছে। অফিসের কাজ, উইকএন্ডে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা, মাঝেমধ্যে সিনেমা দেখা, বাইরে খেতে যাওয়া। জীবনের একটা নিজস্ব ছন্দ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বছরের একটা সময়ে এসে সেই ছন্দ কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। শরতের আকাশে সাদা মেঘ দেখলেই মনে পড়ে যায়, বাড়িতে নিশ্চয়ই কাশফুল ফুটেছে। ভোরবেলা কোথাও না কোথাও মাইকে বেজে উঠছে মহালয়ার গান। পাড়ার ক্লাবের সামনে বাঁশ পড়েছে। প্রতিমার কাঠামো তৈরি হচ্ছে।

আর মনে পড়ে মেদিনীপুরের সেই ছোট্ট শহরটাকে।

সেখানে অর্পণের জন্ম, সেখানেই বড় হয়ে ওঠা। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ওঠার আগে পর্যন্ত পৃথিবী বলতে ওই শহরটুকুই। অথচ সেই ছোট্ট পৃথিবীর মধ্যে কত কিছু ছিল! কত রাস্তা, কত মাঠ, কত দুষ্টুমি, কত অকারণ আনন্দ!

স্কুল পালিয়ে মাঠে ফুটবল খেলতে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। শেষ পিরিয়ডে অঙ্কের ক্লাস, সামনে বোর্ডে স্যারের চক ঘষার শব্দ, আর জানলার বাইরে রোদে ঝলমল করছে মাঠ। একবার চোখাচোখি হলেই বন্ধুদের মধ্যে ইশারা চালাচালি শুরু হয়ে যেত। তারপর কোনও এক ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়া। বইখাতা কারও

সাইকেলের ক্যারিয়ারে, কারও ব্যাগে। স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই মাঠে ফুটবল। খেলা শেষে পুকুরে কিংবা নদীতে ঝাঁপ।

নদীটা খুব বড় ছিল না। বর্ষায় ফুলে উঠত, শীতে বালির চর জেগে থাকত। সেই নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে কতবার বাড়িতে বকুনি খেয়েছে অর্পণ। একবার তো স্রোতের টানে বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল। বন্ধুরা মিলে টেনে তুলেছিল তাকে। সে দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে মায়ের মুখটা মনে পড়লে এখনও বুকের ভিতর কেমন করে ওঠে। কিন্তু পরের সপ্তাহেই আবার নদীতে যাওয়া। কৈশোরের সাহস আর বোকামির মধ্যে যে খুব বেশি তফাত নেই, সেটা বোঝার বয়স তখন হয়নি।

পিকনিকের দিনগুলোও ছিল অন্যরকম। কারও বাড়ি থেকে চাল, কারও বাড়ি থেকে আলু, কেউ নিয়ে আসত ডিম, কেউ মাংস। রান্না করতে গিয়ে অর্ধেক পুড়িয়ে ফেলা, খাওয়ার সময় কে বেশি পেয়েছে তা নিয়ে ঝগড়া, তারপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরা। শীতের দুপুরে হঠাৎ ঠিক হয়ে যেত, আজ একটু দূরে যাওয়া যাক। কোথায়? সেটা কেউ জানত না। রাস্তা যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাওয়া। কখনও গ্রামের মেঠো পথ, কখনও রেললাইনের পাশ দিয়ে, কখনও কোনও অচেনা মাঠের ধারে বসে থাকা।

তখন সময়ের কোনও দাম ছিল না।
অথবা বলা ভালো, সময়ের হিসেব রাখার
প্রয়োজন ছিল না।

সেই দলটার ছেলেগুলো এখন ছড়িয়ে
পড়েছে নানা জায়গায়। কেউ কলকাতায়,
কেউ পুণেতে, কেউ হায়দরাবাদে, কেউ
আবার বিদেশে। প্রত্যেকের জীবনেই এখন
আলাদা ব্যস্ততা। কারও বিয়ে হয়েছে, কেউ
বিয়ের কথা ভাবছে, কেউ বাড়ি কেনার
জন্য টাকা জমাচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে
মারোমধ্যে পুরনো ছবি ভেসে ওঠে। স্কুলের
ইউনিফর্ম পরা কয়েকটা রোগা ছেলের
মুখ, পিছনে স্কুলের দেওয়াল। কারও চুল
এলোমেলো, কারও চোখে দুষ্কুমির ঝিলিক।
ছবির মানুষগুলোকে দেখে মনে হয়, এরা
কি সত্যিই সেই মানুষ, যারা এখন মাসের
শেষে ইএমআই মেটায়, অফিসের মিটিংয়ে
বসে প্রেজেন্টেশন দেয়, কিংবা ছুটির
আবেদন লিখতে গিয়ে দশবার ভাবে?

অর্পণও তো এখন সেই দলেরই একজন।

তবু পূজোর সময়টায় যেন সবাই আবার
পুরনো হয়ে যায়।

প্রতি বছর পূজোর আগে থেকেই শুরু
হত পরিকল্পনা। কে কবে পৌঁছবে, যষ্ঠীর
সকালে কোথায় দেখা হবে, অষ্টমীর
অঞ্জলি কোথায়, নবমীর রাতে খাওয়া হবে
কার বাড়িতে। সব পরিকল্পনা যে শেষ

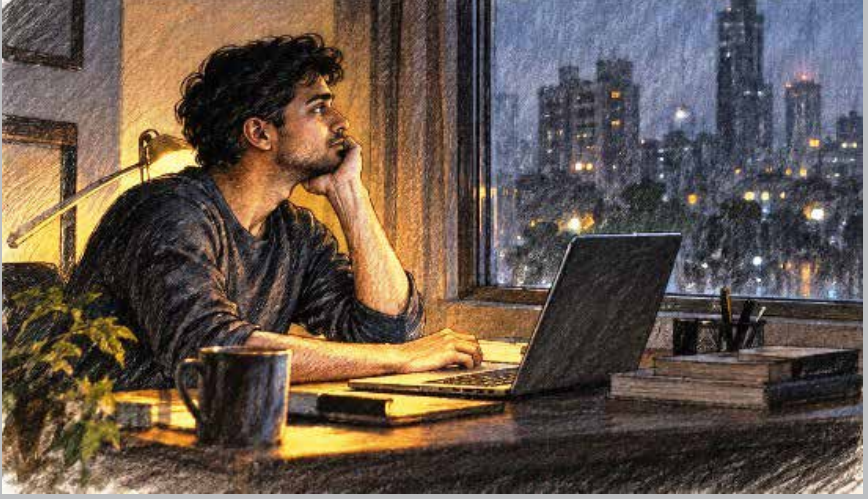
পর্যন্ত মেনে চলা হত, তা নয়। বরং বেশির
ভাগ পরিকল্পনাই ভেঙে যেত। কেউ দেরি
করে উঠত, কেউ বাড়ির কাজে আটকে
যেত, কেউ আবার হঠাৎ অন্য বন্ধুকে
নিয়ে হাজির হত। কিন্তু তাতে কী! শেষ
পর্যন্ত সবাই কোনও না কোনও সময়ে
একসঙ্গে হতই।

রাত বাড়লে শহরের আলো পেরিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে কত কথা হত। পুরনো
প্রেম, নতুন প্রেম, চাকরির হতাশা,
ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কারও বাড়ির অশান্তি,
কারও গোপন দুঃখ। যে কথাগুলো সারা
বছর কাউকে বলা হয়ে ওঠে না, পূজোর
কয়েকটা রাতে সেগুলোও অনায়াসে
বেরিয়ে আসত। কেউ কাউকে বিশেষ
উপদেশ দিত না। শুধু পাশে বসে থাকত।
কখনও হাসত, কখনও চুপ করে থাকত।

এবার সেই জায়গাটাই ফাঁকা পড়ে থাকবে।

গত দু'বছর পূজোয় বাড়ি যাওয়া হয়নি
অর্পণের। প্রথম বছর নতুন প্রজেক্টের
কাজ, দ্বিতীয় বছর অফিসে লোক কম
থাকায় ছুটি মেলেনি। বাড়িতে মা ফোনে
মুখে কিছু বলেননি। বাবা বরাবরের মতোই
সংক্ষিপ্ত কথায় ফোন শেষ করেছেন। কিন্তু
ফোন রাখার পর অর্পণ বুঝতে পেরেছে,
দু'জনেই অপেক্ষা করেছিলেন।

দিদির বিয়ে হয়ে গেছে কয়েক বছর।



কলকাতায় থাকে। পুজোর সময় দু-এক দিনের জন্য বাপের বাড়িতে আসে। মা তখন সকাল থেকে রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকেন। বাবা বাজার থেকে একটু বেশি মাছ কিনে আনেন। বাড়ির ভিতর একটা আলাদা উৎসবের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। অর্পণ থাকলে সেই আনন্দটা যেন আরও সম্পূর্ণ হত।

অথচ গত দু'বছর সে ছিল না। এই অনুপস্থিতির একটা অপরাধবোধ আছে। দূরে থাকা মানুষদের হয়তো এই অনুভূতিটা একটু বেশি হয়। নিজের জীবন গুছিয়ে নেওয়ার তাগিদে তারা বাড়ি ছাড়ে। ভালো চাকরি, ভালো বেতন, নিজের পায়ে দাঁড়ানো—সবই তো জরুরি। বাবা-মা নিজেরাই তো চেয়েছিলেন ছেলে বড় হোক, নিজের একটা পরিচয় তৈরি করুক। কিন্তু বড় হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় যে বাড়ি ফেরার দিনগুলো ক্রমশ কমে আসবে,

সেটা কি তাঁরা ভেবেছিলেন?

অর্পণ নিজেও ভাবেনি। গত কয়েক দিন ধরে অফিসে কাজের ফাঁকে বারবার ফোনটা খুলছে সে। বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একের পর এক মেসেজ আসছে।

কে যষ্ঠীর সকালে পৌঁছবে, কে সপ্তমীর দিন আসছে, কার গাড়ি আছে, কে কাকে তুলে নেবে। কেউ পুরনো ছবির সঙ্গে লিখেছে, এ বার কিন্তু কাউকে ছাড়া চলবে না। কেউ লিখেছে, নবমীর রাতে সেই পুরনো জায়গাটায় বসা হবে।

অর্পণ মেসেজগুলো পড়ে। কখনও হাসির ইমোজি দেয়, কখনও দু-একটা কথাও লেখে। কিন্তু নিজের পুজোর পরিকল্পনা নিয়ে কিছু লেখে না।

কীই বা লিখবে?

এবারও ছুটি পাওয়া নিয়ে সংশয়। অফিসে কাজের চাপ বাড়ছে। নতুন একটা প্রজেক্টের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়েছে। ম্যানেজারকে ছুটির কথা বলেছিল। উত্তর এসেছিল, পরিস্থিতি বুঝে জানানো যাবে। এই ‘জানানো যাবে’ কথাটার অর্থ অর্পণ জানে। শেষ মুহূর্তে হয়তো বলা হবে, এখন ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়।

তারপরও প্রতিদিন মনে মনে হিসেব কষে সে। যদি সপ্তমীর দিন বেরোয়? যদি অষ্টমীর সকালে পৌঁছতে পারে? যদি ফেরার টিকিটটা একটু পরে কাটে? কিন্তু সব হিসেবের শেষে একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হয়। যাওয়া সম্ভব নয়।

নিজের মনকে বোঝানোর চেষ্টা করে অর্পণ। পূজো তো শুধু কলকাতা বা মেদিনীপুরে হয় না। বেঙ্গালুরুতেও পূজো হয়। এখানেও মণ্ডপ আছে, ঢাক বাজে, মানুষ নতুন জামাকাপড় পরে বেরোয়। বাঙালি বন্ধুরা মিলে আড্ডা দেয়। চাইলে সেখানেও ভালো কাটানো যায়।

কিন্তু নিজেকে বোঝানো আর সত্যিই মেনে নেওয়া তো এক নয়।

বেঙ্গালুরুর পূজোতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দেওয়ার সময়ও তার মনে পড়ে

যায় বাড়ির পাড়ার মণ্ডপটা। মনে পড়ে যায়, সপ্তমীর সকালে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার কথা। কারও জামার বোতাম লাগানো হয়নি, কারও নতুন জুতোয় পা কেটে যাচ্ছে, কেউ আবার পুজোর আগের রাতে ঘুমোয়নি বলে বারবার হাই তুলছে। সেই ছোট ছোট অসংলগ্ন মুহূর্তগুলোই যেন পুজোর আসল স্মৃতি হয়ে থেকে গেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে ঘরে বসে ছিল অর্পণ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। টেবিলের উপর ল্যাপটপ খোলা, পাশে আধখাওয়া কফির কাপ। ফোনে আবার একটা ছবি এসেছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন পুরনো দিনের পিকনিকের ছবি পাঠিয়েছে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলো। কারও গায়ে রঙচটা টি-শার্ট, কারও হাতে ফুটবল। মাঝখানে অর্পণ। তার মুখে এমন একটা হাসি, যা এখনকার কোনও ছবিতেই আর আসে না।

অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। কখন যে মানুষ বড় হয়ে যায়, বোঝা যায় না। একদিন হঠাৎ দেখা যায়, যে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দুপুর কাটত, সেখানে আর যাওয়া হয় না। যে বন্ধুর সঙ্গে কোনও কারণ ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটা যেত, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যও এখন সময় বার করতে হয়। যে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পড়লে মনে হত পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়,

সেই বাড়িতে ফেরার জন্য ছুটি চাইতে
হয়, টিকিট কাটতে হয়, হিসেব মেলাতে
হয়।

হঠাৎ নিজের উপরেই রাগ হল অর্পণের।
সব কিছু কি হিসেব করে চলে? যে
চাকরির জন্য এত পরিশ্রম, সেই চাকরির
কাছেই কি প্রতি বছর এই কয়েকটা দিন
হেরে যেতে হবে? ছুটি না পেলে কি
সত্যিই কিছু করার থাকে না? নাকি ধীরে
ধীরে সে নিজেই মেনে নিতে শিখছে,
বাড়ি ফেরা একটা বিলাসিতা?

পরের দিন অফিসে গিয়েও মন বসল না।

মহালয়ার ঠিক পরের দিন বিকেলে
একটা ইমেল এল। কয়েক সপ্তাহ আগে
অন্য একটি সংস্থায় ইন্টারভিউ দিয়েছিল
অর্পণ। তখন আর বিশেষ আশা করেনি।
প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফার ইন্টারভিউ
হয়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন কোনও
খবর নেই। ভেবেছিল, হয়তো অন্য
কাউকে নিয়েছে তারা।

ইমেলটা খুলে প্রথমে বিশ্বাস করতে
পারেনি।

তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। বেতন এবং
অন্যান্য শর্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা
হবে। জয়েন করতে হবে এক মাস পরে।

একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল অর্পণের। যেন
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা কোনও জানলা হঠাৎ
খুলে গেছে। চাকরি বদলানোর ইচ্ছে
তার ছিলই। বর্তমান কাজের একঘেয়েমি,
দায়িত্ব বাড়লেও নিজের মতো করে কিছু
করার সুযোগ না পাওয়া—এসব নিয়ে
বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিল। কিন্তু
সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস হচ্ছিল না। নতুন
চাকরি, নতুন পরিবেশ, নতুন করে সব
কিছু শুরু করা—কম ঝুঁকি নয়।

তবু সেই মুহূর্তে তার মাথায় প্রথম যে
কথাটা এল, সেটা চাকরি বদলানো নিয়ে
নয়।

পুজো। এক মাস পরে জয়েনিং। তার
মানে এখনই ছুটি নিয়ে কোনও সমস্যা
নেই। হাতে কয়েকটা দিন আছে। চাইলে
সে বাড়ি যেতে পারে। শুধু যেতে পারে
নয়, গত দু'বছরের জমে থাকা না-ফেরার
কষ্টটুকুও যেন এই ক'দিনে একটু মুছে
নিতে পারে।

অর্পণ আবার ইমেলটা পড়ল। তারপর
ফোনটা তুলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলল।
বন্ধুরা তখনও নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে
ব্যস্ত। কেউ লিখেছে, এ বার সবাইকে
নিয়ে একটা গ্রুপ ছবি চাই। কেউ
লিখেছে, পুরনো দিনের মতো নদীর ধারে
যাওয়া যায় কি না।



অর্পণ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।
তারপর বিমান সংস্থার ওয়েবসাইট খুলল।
পঞ্চমীর দিন বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা
যাওয়ার টিকিট পাওয়া গেল। দামটা একটু
বেশি। সাধারণত এত টাকা দিয়ে সে
টিকিট কাটে না। আরও দু-একটা বিকল্প
তারিখও দেখল। তারপর আর সময় নষ্ট
করল না।

টিকিট কাটা হয়ে গেল।

কাজটা শেষ হতে কয়েক মিনিটের বেশি
লাগেনি। অথচ বুকের ভিতর জমে থাকা
ভারটা যেন মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল।
জানলার বাইরে তখনও বৃষ্টি। রাস্তার
আলোয় ভেজা ফুটপাথ চকচক করছে।
পাশের বাড়ির বারান্দায় কেউ একটা
গাছের টব সরিয়ে রাখছে। পৃথিবীর

কোথাও কোনও পরিবর্তন
হয়নি। শুধু অর্পণের মনে
হচ্ছে, সে যেন অনেক দূর
থেকে নিজের কাছে ফিরে
এসেছে।

সেদিন রাতে বাড়িতে
ফোন করল।

মা ফোন ধরতেই অর্পণ
বলল, পঞ্চমীর দিন
পৌঁছেবে। প্রথমে মা যেন
কথাটা বুঝতেই পারলেন

না। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় জানতে
চাইলেন, কখন পৌঁছেবে, কীভাবে আসবে,
খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কি না।
অর্পণ বুঝতে পারল, মা আনন্দটা গোপন
করার চেষ্টা করছেন। বাবা ফোনের কাছে
এসে শুধু বললেন, ঠিক আছে, সাবধানে
আসিস।

কথা শেষ হয়ে গেল। খুব বেশি আবেগ
ছিল না। কোনও দীর্ঘ কথোপকথনও
নয়। কিন্তু ফোন রাখার পর অর্পণের মনে
হল, এত দিন পরে যেন বাড়ির দরজাটা
সত্যিই তার জন্য খুলে গেল।

এরপর বন্ধুরা জানল। হোয়াটসঅ্যাপ
গ্রুপে হঠাৎ এতগুলো মেসেজ জমা হল
যে অর্পণ সব ক'টার উত্তর দিতে পারল
না। কেউ তাকে নিয়ে মজা করল, কেউ

বলল, শেষ পর্যন্ত ভোল পাল্টেছে। কেউ
আবার লিখল, এ বার আর কাউকে ছাড়া
হবে না।

অর্পণ শুধু হাসল। সে জানে, বাড়ি
ফিরলেই সব কিছু আগের মতো হয়ে
যাবে না। বন্ধুরা এখন আর সারাদিন
সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। নদীর
ধারে গিয়ে বসার মতো অবসর সবার
হয়তো থাকবে না। বাবা-মাও আগের
মতো নেই। বাবার চুল আরও সাদা
হয়েছে, মায়ের হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে।
বাড়ির পুরনো ঘরটায় হয়তো এখনও
তার স্কুলের বই রাখা আছে, কিন্তু সেই
বইগুলোর পাতায় আটকে থাকা সময়
আর ফিরবে না।

তবু ফেরার মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার
আছে। ফিরে যাওয়া মানে সব কিছু
আগের মতো করে পাওয়া নয়। ফিরে
যাওয়া মানে বদলে যাওয়া মানুষগুলোর
পাশে আবার কিছুটা সময় কাটানো।
মায়ের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে অকারণে গল্প
করা। বাবার সঙ্গে বিকেলে বাজারে
যাওয়া। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে বসে একই
গল্প বারবার শোনা। সেই চেনা রাস্তায়
হাঁটা, যেখানে প্রতিটি মোড়ের সঙ্গে
জড়িয়ে আছে একটা করে স্মৃতি।

হয়তো এ বার নদীতে ঝাঁপ দেওয়া
হবে না। হয়তো সাইকেল নিয়ে হঠাৎ

কোথাও বেরিয়ে পড়াও হবে না। কিন্তু
নদীর ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকা
তো যায়। পুরনো স্কুলটার সামনে দাঁড়িয়ে
থাকা যায়। বন্ধুদের সঙ্গে রাত বাড়িয়ে
আড্ডা দেওয়া যায়।

আর পুজোর ভিড়ের মধ্যে কোনও এক
মুহূর্তে চোখ বন্ধ করলে হয়তো সেই
ছোট্ট শহরটা আবার ফিরে আসবে।
ফিরে আসবে সেই ছেলেটা, যে একদিন
স্কুল পালিয়ে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল,
যে নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে
একবারও ভাবেনি কী হবে, যে বিশ্বাস
করত পৃথিবীটা অনেক বড়, অথচ তার
সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটা ছিল নিজের
শহরের কয়েকটা চেনা রাস্তা।

পঞ্চমীর বিমানের টিকিটটা ফোনে সেভ
করে রাখল অর্পণ। তারপর অনেক দিন
পরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেল।

বেঙ্গালুরুর আকাশে তখনও মেঘ ছিল।
বৃষ্টি থামেনি পুরোপুরি। কিন্তু অর্পণের
মনে হচ্ছিল, কোথাও একটা শরৎ এসে
গেছে।

এ বার পুজোয় সে বাড়ি ফিরবে।
এ বার আর কোনও হিসেব নেই। কোনও
সংশয় নেই।

শুধু ফেরার অপেক্ষা।



অন্তরা চৌধুরি

দুর্গম বক্সা পাহাড়ের কথা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় পড়েছিলাম। অত উঁচু পাহাড়ে ইংরেজজরা দুর্গ তৈরি করেছিল। আর সেখানেই বেশ কিছুদিন বন্দি ছিলেন নেতাজি। নেতাজিকে নিয়ে কার না কৌতূহল নেই! এর আগেরবার যখন ডুর্যাস গিয়েছিলাম, তখন সান্তালাবাড়ি থেকেই বক্সা পাহাড়কে টাটা করে ফিরে আসতে হয়েছিল। সান্তালাবাড়িতে আমরা পৌঁছেছিলাম যাই যাই বিকেলে। সেই আধো আলো আধো অন্ধকার আর চারিদিকে শুনশান প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বক্সা পাহাড় যাওয়ার রাস্তা শুরু হয়েছে। কেন জানি না, সেইদিন থেকে বক্সাকে খুব রহস্যময় মনে হয়েছিল। তখনই ভেবে নিয়েছিলাম, একদিন না একদিন

বক্সা-জয় করবই। অবশেষে এমন একটা সুযোগ এসে গেল।

গতবারে রাজাভাতখাওয়া এসে খুব ভাল লেগেছিল। আসলে ডুর্যাসের প্রেমে পড়েনি এমন বেরসিক মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তাই সকাল বেলায় আরণ্যক ব্রেকফাস্ট করেই আমরা রওনা দিলাম সান্তালাবাড়ির উদ্দেশে। নির্দিষ্ট একটা জায়গা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। এরপর আর গাড়ি যাওয়ার পথ নেই। সেখান থেকে চরণ বাবুর ট্যাক্সিই একমাত্র ভরসা। সেখানেই রয়েছে মিলিটারি চেকপোস্ট। আমরা বেশ আনন্দ সহকারে উঠতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝলাম, পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ওঠা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ততটা নয়। দুর্গম, বড় দুর্গম সেই পথ। কিছুটা করে উঠেই হাঁপিয়ে যাই। সেদিনই

বুঝলাম মোটা হওয়া খুব খারাপ। যত লোক নেমে আসছে প্রায় সকলকেই জিজ্ঞাসা করছি, আর কতটা? কেউই খুব একটা সন্তোষজনক উত্তর দিচ্ছেন না। কেউ বলছেন, ‘এই তো সবে শুরু। এখনও অনেকটা।’ কেউ বলছেন, ‘এই তো কুড়ি পার্সেন্ট এলেন। এখনও আশি পার্সেন্ট বাকি।’ আবার কেউ বলছেন, ‘আমরা যেতে পারিনি। অনেকটা গিয়ে ফিরে এলাম।’ এইসব মন্তব্যগুলো হতাশ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মনে হতেই পারে, ঢের হয়েছে। ‘চল মন নিজ নিকেতনে।’ আমার বর অবশ্য ভরসা দিয়েই চলেছিল, একটু চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? যদি সবটা নাও ওঠা যায়, যতটুকু পারা যায়, আমরা না হয় ততটুকুই উঠব।’ এই অভয়বাণী শুনে আমারও গাইতে ইচ্ছে হল, ‘এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব।’

কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। এসেছি যখন, তখন শেষ পর্যন্ত উঠবই। পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। সমতল প্রায় নেই বললেই চলে। কোথাও খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কোথাও বা বেশ কিছুটা ঢালু রাস্তা। একপাশে পাহাড়, অপর পাশে গভীর খাদ। তার মাঝখানে সংকীর্ণ পাহাড়ি রাস্তা। একটু অসাবধান হলেই নিশ্চিত মৃত্যু। অত

গভীর খাদে পড়লে বডিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাস্তা যে যথেষ্ট দুর্গম, তা বলাই বাহুল্য।

এক একটা পাহাড় শেষ হচ্ছে আবার আরেকটা পাহাড় শুরু হচ্ছে। এক একটা বাঁকে পাহাড়ের এক একরকম সৌন্দর্য। তাই উপরে উঠতে যথেষ্ট কষ্ট এবং পরিশ্রম হলেও ওই গহীন অরণ্য ঘেরা পাহাড়ের সৌন্দর্য সব ক্লান্তি নিমেষে ভ্যানিশ করে দিচ্ছিল। অনেক নীচ থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ি নদীর গর্জন। পথ ক্রমশঃ দুর্গম থেকে দুর্গমতর হতে থাকে। একটা সময় যথেষ্ট পরিমাণে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার একপাশেই বসে পড়ি।

ব্যাগে থাকা কিছু শুকনো খাবার আর জলই তখন একমাত্র ভরসা। সেখানেও আমার বর আমাকে সাহুনা দিতে কোনও কিপটেমি করেনি, ‘ওপরে নিশ্চই কোনও খাবার দোকান আছে। চলেই তো এলাম। আর একটু।’ মনে মনে ভাবলাম, ‘ভারি আমার জ্ঞানদাতা এসেছেন! নিজে যেন আগে কতবার এসেছে!’ আবার হাঁটতে শুরু করেছি। এমন সময় দু চারজন টুরিস্ট নেমে আসছেন। মুখ তাঁদের বক্সা বিজয়ের প্রচ্ছন্ন গৌরব। তাঁদেরকেও আমরা যথারীতি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখান থেকে আর কতদূর?’ তাঁদের



মধ্যে একজন আশ্বস্ত করলেন, ‘দেখুন, এতদূর যখন এসেছেন, তখন দুর্গটা না দেখে ফিরে যাবেন না।’ কথাটা বেশ মনে ধরেছিল। সত্যিই তো! এতদূর এসে ফিরে গেলে তো নেতাজি দুঃখ পাবেন। কিন্তু ওই দুর্গম রাস্তা ধরে হাটতে হাটতে ভাবছিলাম, এমন একটা বিচিত্র জায়গার সন্ধান ইংরেজদের দিল কে! আর কেনই বা এইরকম একটা জায়গায় নেতাজিকে তারা লুকিয়ে রাখতে গেল। শুনেছিলাম, ঘোড়ায় করে নাকি রাজবন্দিদের এখানে নিয়ে আসা হত।

একটা জায়গায় আসার পর দেখলাম পাহাড়ের গায়ে স্থানীয় মানুষদের অজস্র ছোট ছোট বাড়ি। বাড়ি লাগোয়া বাগান। গরু, মুরগি, ছাগল সবই রয়েছে তাদের বাড়িতে। শীতকালীন ফুল আলো করে

রেখেছে বাগানগুলো। একবালক দেখেই বেশ ভাল লাগল। ঠিক যেন স্বপ্ন দিয়ে সাজানো একটা পাহাড়ি গ্রাম। দেখলাম, সেখানে স্থানীয় মানুষ পরিচালিত হোমস্টেও রয়েছে। পরেরবার এসে যে এখানে এক-দু রাত থাকতেই হবে। কিছুদূর যাওয়ার পর বেশ একটা সমতল জায়গা দেখতে পেলাম। টিন দিয়ে ঘেরা একটা ছোট দোকান। গাছের তলায় কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি গোল টেবিল আর চেয়ার। এক নেপালী দিদি অত্যন্ত বিরস মুখে বসে আছেন। সামনেই টাঙানো মেনু চার্ট। তাতে কয়েকটা লোভনীয় খাবারের যা দাম লেখা আছে, তা দেখে আমাদের মাথায় হাত। এই দুর্গম এলাকায় এই সমস্ত খাবারের এত অবিশ্বাস্য কম দাম! ডিম ভাজা, ডিম সেদ্ধ মাত্র দশ টাকা। এই এলাকায় ডিমের

দাম হওয়া উচিত ছিল অন্তত পঞ্চাশ টাকা। যাই হোক, আমরা ম্যাগি আর ডিম সেক্সর অর্ডার দিয়ে শান্ত হয়ে সেই গাছের তলায় বসলাম। কত হাজার ফুট উঁচুতে যে আছি, তার ঠিক নেই। ফোনের সিগন্যাল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে হ্যালির ধূমকেতুর মতো একবার করে উদয় হচ্ছে। বেশ ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। অতটা পাহাড়ে ওঠার পর ম্যাগি আর ডিম সেক্স বেশ অমৃতের মতো লাগল।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। দেখলাম আমাদের পাশ দিয়ে অনেক স্থানীয় মানুষ পিঠে বেতের ঝুড়ি (চা-শ্রমিকদের ঝুড়ির মতো) নিয়ে উপরে উঠছেন। ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাতে রয়েছে দৈনন্দিন সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা নিজেদের নিয়েই উঠতে পারছি না। আর এঁরা এত বোঝা নিয়ে উঠছেন। সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সপ্তাহে ওই একদিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার হাট বসে। সোমবার রাত্রি দুটোর সময় এঁরা সমবেত হয়ে সান্তালাবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। ভোর পাঁচটা, ছ’টা নাগাদ পৌঁছে যান। সেখানে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করেন।

দুপুর বারোটা-একটা নাগাদ পৌঁছে যান। বজ্রার আরও উপরে আছে লেপচা খা নামের একটি সাজানো গ্রাম। এছাড়াও আশেপাশে বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে। এঁদের কথা শুনে ভেতরটা কেমন হিম হয়ে আসে। যে কোনও দরকারে পায়ে হেঁটে নিচে নামা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। ভাবছিলাম, বর্ষাকালে এঁদের কী অবস্থা হয়! আমরা শুকনো ডাঙাতেই আছাড় খাচ্ছি। বর্ষাকালে এই পাহাড়ের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন কী হবে! এমন কত আশঙ্কা যে মনের মধ্যে ভিড় করছে! আমাদের পাশেই সেনাবাহিনীর এক জওয়ান খানিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এসব কথা শুনে মুচকি হেসে জানালেন – ‘প্রথম এসেছেন তো! তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিছুদিন থাকুন। সব অভ্যেস হয়ে যাবে।’

আমরা এইভাবে জীবনধারণ করা দূরে থাক, ভাবার সাহসটুকুও পাই না। অথচ এঁদের মুখে সবসময় হাসি। কোনও অভিযোগ নেই। না বিধাতার প্রতি, না তো নিজেদের অদৃষ্টের প্রতি, আর না তো প্রশাসনের প্রতি। ওইরকম একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে গিয়ে ভাবতে কষ্ট হয় যে আমরা পশ্চিমবঙ্গেই আছি। সমতলে কত হিংসা, কত মারামারি। অথচ এঁরা



আমাদেরই একজন। কিন্তু কত আলাদা।
কী সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এঁদের জীবন!
অথচ, আমরা এত নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের
মধ্যে থেকেও কতই না অভিযোগের
ডালি সাজাই প্রতিদিন। কত কষ্ট করে
নীচ থেকে পিঠে করে এঁরা জিনিস বয়ে
আনছেন। তারপরেও এখানকার স্থানীয়
দোকানে ডিমভাজা বা ডিমসেদ্ধ কী করে
যে মাত্র দশ টাকায় দিচ্ছে, তা ভাবলেই
অবাক হতে হয়। এতটাই সরল এই
পাহাড়ের মানুষ।

হাঁটতে হাঁটতে আবার বেশ কিছুটা উপরে
উঠতে লাগলাম। সময় তখন সকাল

এগারোটা। আকাশে বেশ কালো করে
মেঘ জমা হয়েছে। অদ্ভুত এক ভাললাগা
নিয়ে এগিয়ে চলেছি। অবশেষে একটা
পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল
সেই ঐতিহাসিক বক্সা ফোর্টের কিছুটা
অংশ। সেই মুহূর্তে যে কী আনন্দ হল
বলার নয়। ইয়েস। পেরেছি। পেরেছি।
মোটা বলে সবাই বড্ড খ্যাপাত। মোটা
হওয়াটা ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে কোনও
বাধাই নয়। মনের জোরটাই আসল।
আমরা যেখানে ছিলাম, ঠিক তার পাশের
পাহাড়টাতেই রয়েছে বক্সা ফোর্ট। যেতে
যেতেই পাহাড়ের কোলে আবার একটা
ছোট্ট দোকান চোখে পড়ল। এক নেপালী

বয়স্ক মহিলা বেশ হাসি মুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। দেখলাম পাহাড়ি খাবারের পাশাপাশি সেখানে রয়েছে পার্বত্য ফুচকা। আমরা সেটাই প্রথমে খেলাম। অতখানি পাহাড়ে ওঠার পর টক জল সহকারে সেই ফুচকা অমৃতের মতো লাগল। দোকানের পাশেই বাগান ঘেরা বসার জায়গা। মাথায় চটের ছাউনি। আমরা সেখানেই বসে পড়লাম। মোমো আর ডিম ভাজার অর্ডার দিলাম। পাহাড়ি কুকুরদের একটা কমন বৈশিষ্ট্য আছে। তারা খুব সহজেই যে কোনও মানুষকে আপন করে নেয়। সেই দোকানেও একটা বেশ লোমওয়ালা হলুদ রঙের কুকুর ছিল। সে খুব সহজেই আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। দু প্যাকেট বিস্কুট খাওয়াতেই তার খুশি দেখে কে। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা নতুন করে যেন প্রাণশক্তি ফিরে পেলাম। অবশেষ পৌঁছলাম বক্সা ফোর্টে। বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই বক্সা ফোর্ট। গেটের কাছে যেতেই চোখে পড়ল রাজবন্দিদের উদ্দেশে রবি ঠাকুরের লেখা কবিতার ফলক। আর ঠিক তার পাশেই রাজবন্দিরা সমবেত হয়ে রবি ঠাকুরের উদ্দেশে যে কবিতা লিখেছিলেন, তার ফলক। সেখানে পৌঁছে কতরকম যে অনুভূতি হচ্ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কয়েক

একর জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল এই বক্সা ফোর্ট। সংরক্ষণের অভাবে ও সরকারি উদাসীনতায় যা এখন ভগ্নপ্রায়। যে সেলে নেতাজিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল বলে কথিত আছে, সেই সেলটা দেখলাম। এর পাঁজরে পাঁজরে লুকিয়ে আছে কত ইতিহাস। একেকটা খসে পড়া পাথর যেন একেকটা স্মারক। সমগ্র বক্সা ফোর্টকে মায়ের মতো আগলে রেখেছে বহু প্রাচীন এক বট গাছ। আমাদের মতো আরও জনাকয়েক উৎসাহী পর্যটক এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন স্থানীয় গাইড। আমরাও সেই গাইডের মুখ থেকে অনেক অজানা কথা শুনলাম। সত্যি মিথ্যা জানি না। পরবর্তীকালে এইসমস্ত গল্পকে আকর্ষণীয় করতে যে কতটা জল মেশানো হয়েছে, তাও বলতে পারব না। শুনলাম, ইংরেজরা তিব্বতীদের অনেক অনুরোধ করে এইখানে এই ফোর্ট বানাতে বলেছিলেন। আট বছর সময় লেগেছিল এই ফোর্ট বানাতে। এখানকার জেলবন্দিদের তিব্বতীরাই দেখাশোনা করতেন। কিন্তু একটা সময় তাঁরা জানতে পারে যে, সুভাষচন্দ্র বসুকে এখানে রাজবন্দি হিসেবে রাখা হয়েছে। তখন তিব্বতীরাই নাকি নেতাজিকে নিজেদের পোষাক পরিয়ে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে নদী পথে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। গল্প শুনতে শুনতে ভাবছিলাম,



এইরকম গহীন পাহাড়-অরণ্যের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া অতিমানব ছাড়া সম্ভব নয়। গাইড কতই না কথা বলে চলেছেন। কিন্তু যে পরিবারটির উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, তাঁদের দেখে মনে হল, এসব ইতিহাস বা নেতাজি নিয়ে বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। গাইড নিতে হয় তাই নেওয়া। গল্প শোনার থেকে তাঁদের কাছে সেলফি তোলা ঢের বেশি ইম্পোর্ট্যান্ট। কেন নেট আসছে না, ফেসবুকে ছবি আপলোড করা যাচ্ছে না, এইসব নিয়েই যাবতীয় আক্ষেপ।

বক্সা ফোর্টে, হেলিপ্যাডে অনেকক্ষণ

ঘুরলাম। একটি পোস্টঅফিস ও হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষও সেখানে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর দেখলাম বেলা পড়ে এসেছে। আবার অতখানি পথ নামতে হবে। লেপচা খা যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছিল না। ঠিক হল, পরেরবার যখন আসব, তখন দুদিন বক্সা আর দুদিন লেপচা খা-তে থাকব।

ফিরে আসছি। মনে তখন বক্সা বিজয়ের আনন্দ। ঘোরও কিছুটা ছিল। কেন জানি না বক্সার সমগ্র পরিবেশকে বেশ রহস্যময় মনে হয়েছিল। ভাবছিলাম রাত্রি বেলায় চাঁদের আলোয় এই আদি অকৃত্রিম

প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়াতে ঠিক কেমন লাগবে। জ্যোৎস্না ভেজা বক্সা ফোর্ট পূর্ণিমার রাতে যে বেশ মোহময়ী হয়ে উঠবে তা বলাই যায়। আমরা যখন নেমে আসছি, তখন বেশ কিছু পর্যটক ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন। আমরা যেমনভাবে অন্যদের জিজ্ঞাসা করছিলাম, আর কত দূর, তাঁরাও একইভাবে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমরা কাউকেই নিরাশ করিনি। সবাইকেই বললাম, অনেকটাই চলে এসেছেন। আর একটু। তাঁরাও যেন নতুন উদ্যমে হাঁটা দিলেন।

দুজন সামান্য মাঝবয়সী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা হাতে একটা রোগা প্যাংলা টাইপের গাছের ডাল নিয়ে উপরে উঠছেন। দুজনের মাথায় বিশাল বিশাল লম্বা সিঁদুরের টিপ। তাঁদের দেখে কেমন যেন মাথায় বদমায়সি বুদ্ধি চেপে গেল। আগ বাড়িয়েই বললাম-

‘মরুতীর্থ হিংলাজের সেই গানটা মনে আছে তো?’

তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক। কী বলবেন, খুঁজে পাচ্ছেন না-

‘হ্যাঁ মানে, ইয়ে মানে, না’।

‘আরে সেই বিখ্যাত গানটা, ‘কতদূর আর কতদূর বলো মা’ এই গানটা গাইতে গাইতে উপরে চলে যান। দেখবেন এক সময়ে ঠিক পৌঁছে গেছেন।’

তাঁরা আদৌ গানটা শুনেছেন কিনা, কে জানে! শুনলেও আমাদের পাগল ভাবলেন কিনা, কে জানে! কিছুদূর নামার পর একটা খাদের ধারে দেখলাম এক মহিলা একটা ছোট্ট টেবিলে শসা, ছোলা সেদ্ধ দেওয়া মিক্সচার, ঝাল মুড়ি আর বুনো কুল বিক্রি করছেন। আমরা গোটা দুয়েক শসা খাবার পর কুল দিতে বললাম। শুকনো কুলকে সরষের তেল, আর নুন লক্ষ্য দিয়ে মেখে একটা গাছের টাটকা পাতায় আমাদের দিলেন। সে যে কী অপরাূপ টেস্ট সে যে না খেয়েছে তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। কুল খেতে খেতে সেই মহিলার সঙ্গেও খানিক গল্প জুড়ে দিলাম। আসলে যে কোনও জায়গায় গিয়ে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশতে আমার খুব ভাল লাগে।

এভাবেই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে নেমে যাওয়া। বক্সা বিজয় শেষ। পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে গাড়ি চলে অনেক দুর্গম জায়গায় গেছি। কিন্তু পায়ে হেঁটে পাহাড় জয়ের রোমাঞ্চই আলাদা। আগেরবার সান্তালাবাড়ি থেকেই ঠিক করেছিলাম, পরেরবার অপারেশন বক্সা। এবার নামতে নামতেই পরের লক্ষ্য ঠিক করে ফেললাম, আরও একধাপ উপরে, অপারেশন লেপচা খা। হে পাহাড়ি জনপদ, তৈরি থেকে। আমরা আসছি।



হোম স্টে কোথায়, এ তো আস্ত হোটেল

হেমন্ত রায়

কয়েকমাস আগে গিয়েছিলাম পাহাড়ে। বছরে দুই থেকে তিনবার উত্তরবঙ্গে যাওয়াটা বহুদিনের অভ্যেস। শহর নয়, পাহাড়ি গ্রামগুলোই আরও বেশি করে টানে। গ্রামের স্নিগ্ধতা, নির্জন প্রকৃতি যেন মন ভাল করে দেয়। ঝাঁ চকচকে হোটেল বা রিসর্ট নয়, পাহাড়ি মানুষদের আতিথেয়তা যেন মন ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অদ্ভুত একটা প্রবণতা লক্ষ করছি। হোম স্টের নামে গজিয়ে উঠেছে বিশাল ইমারত। সেগুলি হোম স্টে না বলে হোটেল বলাই ভাল। একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, সেইসব হোম স্টের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষের তেমন সংযোগ নেই। যারা সেগুলিতে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা কলকাতা বা আশেপাশের লোক।



হাতে অটেল পয়সা। ব্যাঙ্কে রাখা যাবে না। পাহাড়ের জমি লিজ নিয়ে সেখানে একটা হোটেল বানিয়ে দাও। পর্যটনের সঙ্গে বা পাহাড়ি সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্রই নেই। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢালাও প্রচার করছেন। অনেকে বুঝে হোক না বুঝে হোক, চলেও যাচ্ছেন। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য কোথাও ডিজে বাজছে। কোথাও সুইমিং পুলের ধারে উদ্দাম নৃত্য চলছে। কোথাও ঢালাও সুরাপানের আয়োজন। এছাড়াও এমন কিছু কর্মকাণ্ড চলছে, যা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকী খাদ্যতালিকায় পাহাড়ি খাবার নয়। বিরিয়ানি, মোগলাই ঢুকে পড়ছে।

মোদা কথা, পাহাড়ের যে পরিবেশ, তা নষ্ট হচ্ছে। এই সব পর্যটকদের আচরণে স্থানীয় মানুষেরা বেশ বিরক্তই হচ্ছেন। স্থানীয় পাহাড়ি মানুষদের সেখানে কেয়ারটেকার বা রাঁধুনি রাখা হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন ট্যুর অপারেটররা লোক পাঠাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে হুগোড় করছেন। কখনও শিলিগুড়িতে নেমে বাসভর্তি পর্যটক ডিজে বাজিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন সেইসব গ্রামে। এমনকী পাহাড়ি খাবারের বদলে বিরিয়ানি, মোগলাই, কাবাব— এসব মেনুতে ঢুকে পড়ছে।

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন গ্রামেই এমন ছবি দেখা যাচ্ছে। এতে সেইসব গ্রামের নির্জনতা, শিথিলতা নষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ের নিজস্বতাই হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ একজন শিক্ষিত ও উদ্যমী মানুষ। পাহাড়ের পর্যটনকে আরও সুন্দর করে তুলতে নিশ্চয় তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। হোম স্টের নামে শহুরে পর্যটন ব্যবসায়ীরা যে বেলল্যাপনার আয়োজন করেছেন, আশা করি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। পাহাড়ি গ্রাম পাহাড়ি মানুষের হাতেই থাকুক। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, প্রয়োজনে সরকারি অনুদান বা ঋণ দিয়ে হোম স্টে কে আরও আকর্ষণীয় করা হোক। কিন্তু শহুরে ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিকদের প্রবেশ সেখানে বন্ধ হোক।



নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা কাফের গাঁও

উত্তম জানা

ছোট্ট এক গ্রাম। কাফের গাঁও।

কালিম্পং শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয় কাফের গাঁও। অথচ সেখানে পৌঁছানোর পর মনে হয়, শহরটা যেন বহু দূরে কোথাও পড়ে আছে। মোবাইলের ব্যস্ততা, গাড়ির হর্ন, মানুষের তাড়া—সবকিছু একে একে পিছনে ফেলে পাহাড়ের কোলে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে সবুজের ঢেউ, চারদিকে পাহাড়, আর তার মাঝখানে

মাঝবয়সে এসে বুঝেছি, বেড়ানোরও বয়স হয়। একসময় ভ্রমণ মানেই ছিল যত বেশি জায়গা দেখা যায়। সকালে বেরিয়ে সারাদিন ছুটে বেড়ানো, একের পর এক দর্শনীয় স্থান, ছবি তোলা, ফিরে এসে আবার পরের দিনের পরিকল্পনা। এখন আর সেসব ভালো লাগে না। এখন বরং এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। যেখানে অলস



হয়ে বসে থাকা যায়। কিংবা কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই হাঁটা যায়। কাফের গাঁও ঠিক তেমনই।

জায়গাটার কথা কয়েক বছর আগেও শুনিনি। লাভার কথা জানতাম, লোলেগাঁওয়ের কথাও জানতাম। বেশ কয়েক বছর আগে লোলেগাঁও গিয়েওছি। কিন্তু তার কাছেই যে এমন একটা নির্জন গ্রাম রয়েছে, তা তখন শুনিনি। কিন্তু ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে পাহাড় আর অচেনা পাহাড় নেই। ফেসবুকে বেড়ানোর বিভিন্ন গ্রুপ যেমন আছে, তেমনই ইউটিউবেও নানা ভিডিও আপনার

হাতের নাগালে। আপনি একটু ভ্রমণপিপাসু হলে, ভ্রমণের কয়েকটা ভিডিও দেখলে, এমন কত অজানা ঠিকানার হৃদিশ আপনার মোবাইল বেয়ে এসে যাবে!

কয়েক মাস আগে থেকেই একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা। সঙ্গে নিলাম অফিসেরই এক সহকর্মীকে। পাহাড়ি গ্রামে ঘোরার ব্যাপারে তারও আগ্রহ বেশ ভালই। ট্রেনে এনজেপি। সেখান থেকে শিলিগুড়ি জংশন হয়ে শেয়ারে লোলেগাঁও। বাকি পথটুকু নিয়ে গেল হোম স্টে থেকে পাঠানো গাড়ি। হোম স্টেও ছিল যথার্থ হোম স্টের মতোই। অর্থাৎ, বাঁ চকচকে বিলাশ বহুল ব্যাপার নয়। বরং, পাহাড়ি আন্তরিকতায় মোড়া। তাঁদের বাড়িতে, তাঁদেরই একজন হয়ে তিনটে দিন কাটিয়ে দেওয়া।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। শহরের অ্যালার্মের সঙ্গে এই ডাকের কোনও তুলনাই হয় না। জানলা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। দূরের পাহাড় তখনও মেঘের পাতলা চাদরে ঢাকা। কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই। চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসে মনে হল, এতদিন ধরে আমরা আসলে কীসের জন্য এত ছুটেছি? সেদিন কোনও পরিকল্পনা

করিনি। শুধু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।

লেগে যাওয়ার মধ্যে।

পাহাড়ি গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটার মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। রাস্তা কখনও উঠছে, কখনও নেমে যাচ্ছে। দু'পাশে ঘাস, গাছপালা, ছোট ছোট বাড়ি। কোথাও পাহাড়ের ঢালে চাষের জমি, কোথাও বাঁশঝাড়। মাঝেমাঝে দু-একজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা। তাদের মুখে তাড়াহুড়োর চিহ্ন নেই। মনে হয়, সময় এখানে অন্যভাবে চলে।

বিকেলের দিকে পাহাড়ের আলো বদলে গেল। দূরের আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে পড়ছে। আমি তখন গ্রামের এক নির্জন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। আশপাশে কেউ নেই। শুধু বাতাসে পাতার শব্দ। সেই মুহূর্তে মনে হল, জীবনে আসলে খুব বেশি কিছু লাগে না। একটু সময়, একটু নির্জনতা আর সামনে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতি—এই তো!

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখি, নীচে গভীর খাদ। তার ওপারে আরও পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে রোদ আর ছায়ার খেলা। একটু পরেই মেঘ এসে ঢেকে দিল সব। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঘ সরে গিয়ে খুলে গেল সবুজের বিশাল ক্যানভাস। প্রকৃতি যেন নিজের মতো করে ছবি আঁকছে, আবার মুছেও দিচ্ছে।

কাফের গাঁও থেকে ফিরে আসার সময় তাই মনটা অদ্ভুত ভারী হয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, জায়গাটা শুধু দেখে এলাম না; কিছু একটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। হয়তো নিজের জন্য একটু সময়। হয়তো ভুলে যাওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তর।

হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম, এই পথের আসল সৌন্দর্য কোনও নির্দিষ্ট দৃশ্য নয়। সৌন্দর্যটা লুকিয়ে আছে হাঁটার মধ্যেই। একা হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎ কোনও পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ার মধ্যে। কিংবা কোনও কারণ ছাড়াই ভালো

শহরে ফিরে আবার ব্যস্ততা শুরু হবে। ফোন বাজবে, কাজ জমবে, মানুষ তাড়া দেবে। তবু জানব, পাহাড়ের কোলে এমন একটি গ্রাম আছে, যেখানে একদিন আমি কোনও গন্তব্য ছাড়াই হেঁটেছিলাম।

আর সেই হাঁটায়, অনেকদিন পর, নিজেকেই যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলাম।



জটায়ু
থাকলে
নির্ঘাত
লিখতেন,
সারান্ডায়
স্যারেভার

কুন্তল আচার্য

সারান্ডা। নামটা শুনলেই মনে হয়, গা ছমছমে একটা ব্যাপার। জটায়ু থাকলে নির্ঘাত লিখে ফেলতেন, সারান্ডায় স্যারেভার। ফেলুদা না এলেও মিতিন মাসি এসেছিলেন। উপন্যাসে যেমন আছে, রূপোলি পর্দাতেও তেমনই জমজমাট চেহারায় ধরা দিয়েছে সারান্ডার জঙ্গল।

সারান্ডা যাওয়ার কথা উঠলেই প্রথমে মনে হয়— বেশ দূর তো! কলকাতা থেকে জামশেদপুর, তারপর চাইবাসা। তারপর আরও পথ। ট্রেনের জানলার বাইরের পরিচিত দৃশ্য ধীরে ধীরে বদলে যায়। শহর ফুরোয়, জনপদ ফুরোয়, রাস্তার দু’পাশে গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর একসময় মনে হয়, শহরকে বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছি।



সারান্ডা মানে সাতশো পাহাড়ের দেশ। নামের মধ্যেই যেন তার পরিচয়। পাহাড়, অরণ্য, উপত্যকা—সব মিলিয়ে এক বিশাল সবুজ ভূখণ্ড। তারই মধ্যে কিরিবুরু। কিরিবুরু নামটির সঙ্গে নানা ব্যাখ্যা জড়িয়ে আছে। কিরি মানে নাকি পোকা, আর বুরু মানে পাহাড়। অর্থাৎ, পোকার পাহাড়। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনদিনের ভ্রমণে কোনও পোকার উৎপাত পাইনি, এটুকু বলতে পারি। অতএব, নির্ভয়েই যান। স্থানীয় মানুষের কাছে এই পাহাড়ের নিজস্ব এক পরিচয় রয়েছে। নামের অর্থ

নিয়ে যত কথাই থাক, সেখানে গিয়ে প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ে, তা হল অরণ্য। শালগাছের সারি। মাঝে সেগুন। নাম না জানা আরও কত গাছ। কোন গাছ থেকে কোন পাখি ডেকে উঠছে, কে জানে! কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ, কোথাও হঠাৎ খোলা আকাশ। আর সেই হীরন্ময় নীরবতা।

শহরে আমরা নীরবতাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছি। এখানে নীরবতারও একটা শব্দ আছে। দূরে কোনও পাখি ডাকছে। হাওয়ায় পাতার শব্দ। কখনও ঝাঁঝ। তারপর আবার সব চুপ। এই চুপ করে থাকার মধ্যেই সারান্ডার আসল সৌন্দর্য।

দু’তিন দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানে। বিশেষ কিছু না করেও। সকালে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে পড়া। রাস্তা ধরে অলস পায়ে এগিয়ে যাওয়া। কোথাও বসে থাকা। দূরের পাহাড় দেখা। আবার ফিরে আসা। কোনও তাড়া নেই। কোথাও পৌঁছতে হবে না। এই ‘কোথাও পৌঁছতে না হওয়ার’ আনন্দটাই শহুরে মানুষের কাছে সম্ভবত সবচেয়ে বড় বিলাসিতা।

কিরিবুরুর কাছেই মেঘাতুবুরু। নামটাও যেন কবিতার মতো—মেঘের পাহাড়। সত্যিই সেখানে দাঁড়ালে মনে হয়, মেঘ যেন পাহাড়ের গায়ে এসে থেমেছে। কখনও এত নীচে নেমে আসে যে মনে হয়

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। মেঘ এখানে আকাশে শুধু ভেসে বেড়ায় না। যেন চরে বেড়ায়। সেই শক্তি চাটুজে থেকে ধার করে বলতে হয়, এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে। সেই দৃশ্যের ছবি তোলা যায়। কিন্তু ছবিতে তার পুরোটা ধরা যায় না।

সারান্ডার আর একটি বিশেষত্ব—এখানে প্রকৃতি আর মানুষের জীবন পাশাপাশি হাঁটে। একদিকে গভীর অরণ্য, অন্যদিকে বহু পুরনো জনপদ। কিছুটা নেমে গেলেই, লৌহ আকরিকের খনি। ইস্পাত কারখানা। তার আওয়াজ অবশ্য কিরিবরুতে আসে না। এখানে অনাবিল নিস্তর্রতা, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় পৃথিবীটা বুঝি অনেক পিছনে চলে গেছে।

রাস্তার একদিকে ওড়িশা, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড। সীমানা কাগজে টানা। প্রকৃতির কাছে তার কোনও অর্থ নেই। কোন রাজ্যে কার সরকার, কোন রাজ্যে কে মুখ্যমন্ত্রী, এসব জানতে পাহাড় আর অরণ্যের বয়েই গেছে। পাহাড় একই, অরণ্য একই, বাতাসও একই।

এই অঞ্চলের সঙ্গে সাহিত্যেরও একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বুদ্ধদেব গুহর লেখায় যে অরণ্য, যে নিঃসঙ্গতা, যে বুনো সৌন্দর্য বারবার ফিরে আসে, তার সঙ্গে সারান্ডার অনেক জায়গায় আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চাইবাসা হয়েই আসতে হয়। আর



এই চাইবাসাতেই নিয়মিত আনাগোনা ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়দের। মাঝে মাঝে তাঁরাও ঘুরে যেতেন এই অরণ্যে। তাঁদের লেখাতেও ঘুরেফিরে এসেছে এই সারান্ডার কথা। সিনেমার পর্দাতেও এই অরণ্য এসেছে নানা সময়ে। অরণ্য এখানে শুধু পটভূমি নয়, যেন নিজেই একটি চরিত্র।

যাওয়ার পথটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। সাধারণত বড়া জামদা বা বারবিলে নেমে সড়কপথে এগোতে হয়। তবে ট্রেনের উপর পুরো ভরসা করার আগে সময়সূচি দেখে নেওয়াই ভাল। বিশেষ করে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ইদানীং বেশ বিড়ম্বনায় ফেলছে। বিশেষ করে ফেরার সময় এই ট্রেনের সময়ের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। লেট বললে কম বলা হয়, মহালেট। হাওড়ায়



আশা না রাখাই ভাল। তবে কিরিবুরু হিলটপে একটা হোম স্টে আছে। সেখানেও ঠাই নিতে পারেন।

সারান্ডাকে দেখতে হলে একটু ধীরে যেতে হয়। দু’দিনের জন্য মোবাইলটা পাশে রেখে, সকালে দরজা খুলে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, তারপর কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই হাঁটতে বেরিয়ে পড়তে হয়। একটু গেলেই সেলের প্রচুর কোয়ার্টার। একটা মিনি

পৌছোনের কথা রাত নটায়। রাত বারোটার আগে ঢোকে না বললেই চলে। কখনও মাঝরাতও হয়ে যাচ্ছে। অতএব, সাবধান।

তবে সারান্ডার সৌন্দর্যের জন্য কিছুটা অনিশ্চয়তা মেনে নেওয়া যায়। নইলে, ফেরার পথে সরাসরি না ফিরে জামশেদপুরে নেমে গেলেন। সেখান থেকে অন্য ট্রেন ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে, সকালের দিকে লোকাল ধরে জামশেদপুর। সেখান থেকে অন্য ট্রেন।

থাকার জন্য ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে, আছে সেইল-এর গেস্ট হাউসও। আগেভাগে ব্যবস্থা করে গেলে সুবিধা। কারণ এখানে গিয়ে হঠাৎ শহরের মতো হোটেল খুঁজে পাওয়া যাবে—এমন

ভারতবর্ষ। সারান্ডা আসলে দেখার জায়গা নয়, অনুভব করার জায়গা।

সন্ধে নামার সময় পাহাড়ের গায়ে আলো কমে আসে। অরণ্য আরও গাঢ় হয়। দূরে কোনও অচেনা পাখি ডাকে। হঠাৎ মনে হয়, এত দিন আমরা আসলে কোথায় ছুটছিলাম? তবে নির্ভয়ে হেঁটে বেড়াতে পারেন। বন্য জন্তুর আনাগোনা নেই। একসময় মাওবাদি আনাগোনা থাকলেও আপাতত তা অতীত।

স্নিগ্ধতায় মোড়া দু-তিনটে দিন। যার রেশ থেকে যাবে ফেরার পরেও। মনে হবে, সারান্ডার সেই রাস্তা, সেই শালবন, সেই মেঘাতুবুরুর মেঘ—সব কিছু বুঝি এখনও পিছনে পড়ে আছে।



যথার্থই অলরাউন্ডার

ধীমান সাহা

আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয়েছিল বিতর্কটা। সেরা অলরাউন্ডার কে? প্রায় এক নিঃশ্বাসেই উঠে আসত চারটি নাম। ইয়ান বথাম, রিচার্ড হ্যাডলি, ইমরান খান এবং আমাদের কপিলদেব। চারজনেই ছুটছিলেন একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কাকে ছেড়ে কার

দিকে ঝুঁকবেন? চারজনই সেই কবে তিনশো উইকেটের মাইলস্টোন পেরিয়ে গেছেন। কখনও বথামকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন হ্যাডলি, তো কখনও হ্যাডলিকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন কপিল। ব্যাটিংয়েও এই চারজন নেহাত মন্দ ছিলেন না। বিপদের সময় মাঝে মাঝেই ত্রাতা হয়ে দেখা দিয়েছেন। যেমন, ইমরান খান। ১৯৮৩ ও ১৯৯২ এর বিশ্বকাপে বোলার ইমরানের

ভূমিকা কতটুকু? চোটের জন্য বোলিং করতেই পারছেন না। খেলে গেছেন মূলত ব্যাটসম্যান হিসেবে। আর তিরিশির বিশ্বকাপে কপিলের সেই মহাকাব্যিক অপরাজিত ১৭৫ এর কথা কি চাইলেই ভোলা যায়! বিশ্বকাপের মহাফেজখানায় সেরা ইনিংসের তালিকায় তাকে না রেখে উপায় কী?

এই চারজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইটা প্রায় এক দশক ধরে চলেছিল। এমনকী নয়ের দশকে এক এক করে যখন ক্রিকেটের আঙিনাকে গুডবাই জানানেন, তার পরেও অনেকদিন এই তর্ক বহাল ছিল। একইসঙ্গে চার কিংবদন্তি এক দশক ধরে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই লড়ছেন, বিশ্ব ক্রিকেটে এমন ছবিটা পরে আর দেখা যায়নি। বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন, দ্রুত হারিয়ে গেছেন, এমন উদাহরণই বেশি।

কিন্তু এই চারজন নিয়ে যখন কাগজে-কলমে লড়াই চলত, যাঁরা সেই বিতর্কে অংশ নিতেন, তাঁরাও একটা ব্যাপারে একমত হতেন, এই চারজনকে নিয়ে লড়াই হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই লড়াই এই সময়কে ঘিরে। সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার বাছার ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। সেখানে প্রশ্নহীনভাবে একটি

নামই ভেসে ওঠে, স্যর গারফিন্ড সোবার্স। তাঁর নামে শ্রেষ্ঠত্বের সিলমোহর দিয়ে গেছেন স্বয়ং ডন ব্র্যাডম্যান। এত বছর পরেও এমন কেউ উঠে আসেননি, যিনি তাঁর কৃতিত্বে থাবা বসাতে পারেন।

গ্যারি সোবার্স নিছক একজন ক্রিকেটার নন, একটা মিথ। এই প্রজন্ম যদি পরিসংখ্যানের খাতা খুলে গ্যারি সোবার্সকে মাপতে যায়, তাহলে বিরাট বড় ফাঁক থেকে যাবে। স্যর গ্যারি কোন মাপের ক্রিকেটার, তা মাপার ক্ষমতা ওই তথাকথিত পরিসংখ্যানের নেই। আবার পরিসংখ্যানের মাঝে ‘বিটুইন দ্য লাইন’ টুকু পড়তে পারলে, সে অনেক ছবিই তুলে ধরে। যা সমকালকে ছাপিয়ে মহাকালের ওপরও প্রকাণ্ড এক ছায়া ফেলে যায়।

ছয় বলে ছয় ছক্কা! এই টি২০-র আবহে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে এটা আর কোনও বিস্ময় নয়। কিন্তু এই কৃতিত্ব প্রথম কার? এক কথায় উঠে আসবে স্যর গ্যারি সোবার্সের নাম।

টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক রানের মালিক কে? এখন উত্তরটা হবে ব্রায়ান লারা। কিন্তু ৩৬ বছর ধরে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন গ্যারি সোবার্স।



টেস্ট ক্রিকেটে মোট রানের নিরিখে শীর্ষে কে? একসময় উত্তর ছিল স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। বর্তমান উত্তর শচীন তেডুলকার। কিন্তু স্যর ডনকে ছাপিয়ে একসময় এই রেকর্ডেরও মালিক ছিলেন স্যর গ্যারি সোবার্স। সেঞ্চুরি! সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নামের পাশে ২৬টি সেঞ্চুরি। ব্র্যাডম্যানকে ছাপিয়ে হয়তো যেতে পারেননি। কিন্তু প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিলেন।

এ তো গেল ব্যাটিংয়ের কথা। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর উইকেট সংখ্যা ২৩৫। তার থেকেও বড় কথা। বোলার হিসেবে তাঁর পরিচয় লিখতে গেলে তিনরকম পরিচয় দিতে হবে। বাঁ হাতি জোরে বোলার, বাঁ হাতি অফস্পিনার, বাঁ হাতি লেগস্পিনার। মুরলিখরণ, শ্যেন ওয়ার্ন বা অনিল

কুসলেরা হয়তো সাতশো উইকেটের মাইলস্টোন ছাপিয়ে গেছেন। কিন্তু আজ থেকে ছয় দশক আগে দুশো উইকেট মানেই বিরাট এক মাইলস্টোন।

ব্যাটিং-বোলিংয়ের বাইরে আরও এক স্যর গ্যারি আছেন। তিনি অধিনায়ক সোবার্স। আসলে, সেরা অলরাউন্ডার বোঝাতে গিয়ে তাঁর নেতৃত্বের দিকটায় সেভাবে আলো পড়ে না। ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের পর নেতৃত্বের ব্যাটন এসেছিল সোবার্সের হাতে। দীর্ঘ একটা সময় ধরে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে তিনিই সবথেকে লম্বা সময়ের অধিনায়ক। একটানা ৩৯ টেস্টে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এমন কত রেকর্ড যে তাঁর নামের পাশে ছিল,

এখন হিসেব মেলানোই মুশকিল।

ক্রিকেট মানেই একটা সময় ছিল অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের লড়াই। বলা হত, ক্রিকেট মানে সাহেবদের খেলা। যেসব দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, সেখানেও সাহেবরাই খেলতেন। নেটিভরা বড়জোর বল কুড়িয়ে আনত। একসঙ্গে, এক মাঠে খেলার অধিকার ছিল না। দূর থেকে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

একটা সময় রাজ্যপাট ছিল ডন ব্র্যাডম্যানের হাতে। তাঁর ধারেপাশে বসানো যায়, এমন মাপের ক্রিকেটীয় চরিত্র ছিল না বললেই চলে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি উঠে এলেন আরও একজন। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা বার্বাডোজে। ব্র্যাডম্যান পরবর্তী সময়ে তিনিই যেন ব্র্যাডম্যানের সার্থক উত্তরসূরি। গারফিল্ড সোবার্স হয়ে উঠলেন স্যর গ্যারি।

জন্ম ১৯৩৬। টেস্ট অভিষেক ১৯৫৪তে। অর্থাৎ, মাত্র ১৮ বছর বয়সে। আবির্ভাবই দারুণ সাড়া ফেলেছিলেন, এমনটা বলা যাবে না। প্রথমবার পঞ্চাশ রানের গন্ডি পেরোন নিজের দশ নম্বর ইনিংসে। প্রথম ১৬টি টেস্টে কোনও শতরান ছিল

না। কিন্তু প্রথম যে শতরানটা এল, সেই ইনিংস কিন্তু শতরানে থেমে থাকেনি। ডাবল সেঞ্চুরি ছাপিয়ে এল ট্রিপল সেঞ্চুরি। এখানেই শেষ নয়। যখন থামলেন নামের পাশে অপরাজিত ৩৬৫। পেরিয়ে গেলেন লেন হাটনের ৩৬৪ রানের রেকর্ড। যখন এমন বিরল কীর্তি স্থাপন করলেন, তখন সোবার্সের বয়স মাত্র ২১ বছর। ব্রায়ান লারার ব্যাটে যখন এই রেকর্ড ভাঙল, তখন মাঝখানে ৩৬ বছর পেরিয়ে গেছে। তবে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে সাড়ে তিনশোর ওপর রানের রেকর্ড আজও অটুট।

তিনি ছিলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের মুক্তির সূর্য। কিংবদন্তি ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের পর নেতৃত্বের ব্যাটন আসে সোবার্সের হাতে। শ্রেষ্ঠত্বের অভিমুখে ক্যারিবিয়ানদের যাত্রা শুরু। একেবারেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। যখন ক্রিকেটের ব্যাট তুলে রাখলেন, নামের পাশে ৯৩ টেস্ট, ৮০৩২ রান, ২৬টি শতরান। আর সর্বাধিক সেই অপরাজিত ৩৬৫ তো আছেই। এরই ফাঁকে কাউন্টি ক্রিকেটে ম্যালকম ন্যাশের ছটি বলে হাঁকালেন ছটি ছক্কা।

মাঠের মধ্যে, মাঠের বাইরে, সবমিলিয়ে স্যর গ্যারি ছিলেন এক



বর্ণময় চরিত্র। শুধু নিজের দেশ নয়, সারা পৃথিবীজুড়ে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। কাউন্টিতে দীর্ঘদিন খেলেছেন নটিংহ্যাম শায়ারের হয়ে। এমনকী আমাদের ইডেন গার্ডেন্সেও তিনি দুটি টেস্ট খেলে গেছেন। ১৯৫৮-র টেস্টে করেছিলেন দুরন্ত শতরান। সেই ইনিংসেই রোহন কানহাইয়ের ব্যাট থেকে এসেছিল দুরন্ত সেই ২৫৬ রানের ইনিংস। কানহাইয়ের ইনিংসের সামনে সোবার্সের শতরান হয়তো কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আরও একবার খেলেছেন ১৯৬৬-তে। সেই টেস্টেও করেছিলেন ৭০ রান। ভারত সম্পর্কে বরাবরই ছিল বাড়তি একটা দুর্বলতা। খেলা ছাড়ার পরেও এসেছেন আমাদের ইডেনে।

ইডেনও হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে তাঁদের প্রিয় কিংবদন্তিকে।

দুই দশকের ক্রিকেট জীবনে ইতি টেনেছিলেন ১৯৭৪ সালে। পরের বছরই পেয়েছিলেন নাইটহুড উপাধি। বর্ণবৈষম্য যখন অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন কৃষ্ণাঙ্গদের লড়াই ও আত্মমর্যাদার পতাকাকে তিনি গর্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ফুটবল মাঠে পেলে, ক্রিকেট মাঠে গ্যারি সোবার্স, আর বক্সিংয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে (যিনি পরবর্তীকালে মহম্মদ আলি নামে পরিচিত) — তিন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীড়াবিদ নিজের নিজের খেলায় শাসন করছেন পৃথিবীকে। তখন তা শুধু খেলার মাঠে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসকেও যেন নতুন করে লিখেছেন এই তিন কিংবদন্তি।

সময়টা ১৯৭১। সেবারই অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান সফরে গেল ভারত। বিদেশের মাটিতে সিরিজ জেতার প্রসঙ্গ উঠে এলে সবার আগে উঠে আসে ওই ৭১-এর কথা। সেই সিরিজেই আবির্ভাব হয়েছিল আরও এক মহাতারকার। তাঁর নাম সুনীল গাভাসকার। অভিষেক সিরিজেই করেছিলেন ৭৭৪ রান। যা এত বছর পরেও অটুট। প্রথম টেস্টে সানি খেলেননি। খেলেছিলেন

জয়ন্তীলাল। তিনি ব্যর্থ হওয়ায় সুযোগ আসে গাভাসকারের কাছে। শুরুতেই স্লিপে ক্যাচ ওঠে। গ্যারি সোবার্সের হাত থেকে সেই সহজ ক্যাচ পড়ে যায়। সানি মাঝে মাঝেই বলে থাকেন, ‘সেদিন আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন স্যার গ্যারি। উনি যদি ওই ক্যাচ না ফেলতেন, আমার ক্রিকেট জীবন হয়তো ওখানেই থেমে যেত। কারণ, যাঁর বদলে আমি খেলতে নেমেছিলাম, সেই জয়ন্তীলালের আর কখনও ভারতের হয়ে খেলাই হয়নি।’ ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ হারের পরেও নতুন তারকাকে স্বাগত জানাতে কোনও দ্বিধা হয়নি কিংবদন্তি সোবার্সের। এখনও অমর হয়ে আছে সিরিজের শেষবেলায় এসে তাঁর সেই উক্তি। সোবার্স বলেছিলেন, ‘ভারত এসেছিল শূন্য হাতে। কোনও বড় মাপের প্রত্যাশাও ছিল না। তারা ফিরছে সিরিজ জিতে। তার থেকেও বড় কথা, তারা ফিরে যাচ্ছে এমন এক তরুণকে সঙ্গে নিয়ে যে আগামীর ক্রিকেটকে শাসন করবে।’ কী দূরদর্শী এক মানুষ। সানি যে ভবিষ্যৎ ক্রিকেটকে শাসন করবেন, কত আগে এই ছবিটা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন! সানির প্রতি সেই স্নেহ আজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন। আটের দশকে সেরা অলরাউন্ডারদের লড়াইয়ে তাঁর

ভোট কোনদিকে? মাঝে মাঝেই তাঁর দিকে ধেয়ে এসেছে এই প্রশ্নটা। কপিলের প্রতি কিছুটা যেন দুর্বলই ছিলেন। বলতেন, ‘উইকেট সংখ্যা দিয়ে কপিলের কৃতিত্ব মাপতে যাবেন না। মনে রাখবেন, ও এমন একটা দেশে জন্মেছে, যেটা বিশ্বের সেরা স্পিনারদের দেশ। অধিকাংশ উইকেট তো স্পিনাররাই নিয়ে চলে যায়। তাছাড়া, সেই স্পিনারদের জন্যই উইকেট তৈরি হয়। ফলে, বল হাটুর ওপর ওঠে না। অন্যরা যে সবুজ উইকেটে খেলার সুযোগ পায়, কপিল কিন্তু তা পায় না।’ নিজে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে উঠে এসেছেন। তাই অন্যের সমস্যাটাও বুঝতেন।

সময় থেমে থাকে না। এক প্রজন্মের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায় অন্য প্রজন্ম। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর যে কৃতিত্ব, সেটা একসময় ছাপিয়ে গেছেন ক্লাইভ লয়েড। দু’বার বিশ্বকাপ জয়, একবার রানার্স। ক্যারিবিয়ানদের শ্রেষ্ঠত্বকে আরও অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন লয়েড। কিন্তু লয়েডের এই সাফল্যকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে গেছেন। একটি দিনের জন্যও সেই কৃতিত্বকে খাটো করার চেষ্টা করেননি। এমনকী যে ব্রায়ান লারা তাঁর ৩৬৫-র রেকর্ড ছাপিয়ে যান,



তাঁর সঙ্গেও ছিল দারুণ হৃদয়তা। কখনও কাউকে প্রতিপক্ষ ভাবেননি। বরং বিনয় দেখিয়ে নিজের থেকেও বড় আসন দিয়েছেন।

অতীত আঁকড়ে বেঁচে থাকা নয়। বারবার বলে গেছেন, ‘আজকের জন্য বাঁচুন। প্রতিদিনের বেঁচে থাকাটা উপভোগ করুন।’ বেঁচেছেন রাজার মতোই। মাঠের মধ্যে, মাঠের বাইরেও। একসময় এক ভারতীয় অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। ক্রিকেট আর বলিউড রোমান্সের কথা উঠলে উদাহরণ হিসেবে তাঁর নাম ভেসে ওঠে। সেই সম্পর্ককে কখনও অস্বীকার তো করেনইনি। বরং সেই বান্ধবী সম্পর্কে, সেই সম্পর্ক

নিয়ে শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন। যতদিন বেঁচেছিলেন, মাথা উঁচু করেই বেঁচেছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও মাঠে আসতেন। কয়েকদিন পরেই ছিল তাঁর নব্বই তম জন্মদিন। তার ঠিক কয়েকদিন আগেই থেমে গেল এক মহাজীবনের ইনিংস।

ঠিক চার বছর আগে। বিশ্বকাপ ফাইনালের কয়েকদিন পরেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। এবারও ছিল বিশ্বকাপের আবহ। সারা পৃথিবী মেতেছিল বিশ্বকাপে। ফাইনালের ঠিক আগেই চিরঘুমের দেশে স্যর গ্যারি। দুই খেলার দুই কিংবদন্তির কী অদ্ভুত মিল! দুজনকেই অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিয়ে গেল বিশ্বকাপ।



বাপরে কি
ডানপিটে
ছেলে

দেবায়ন কুণ্ডু

কোন গোকুলে এই ছেলে বাড়ছিল, কে জানে!

বছর দেড়েক আগের কথা। ছেলেটির বয়স তখন সবে তের বছর। হঠাৎ করে এমন একজন আনকোরা ছেলের জন্য এক কোটি দশ লাখ টাকা হেঁকে বসল রাজস্থান রয়্যালস। মুম্বইয়ের ছেলে নয়। দিল্লি বা কলকাতার ছেলে নয়। এই

ছেলের বাড়ি কিনা বিহারের সমস্তপুরে।

হাতে অটেল টাকা থাকলে কতভাবেই না অপচয় করা যায়! যাঁরা আইপিএলের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁদের এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভস্মে ঘি ঢালার এমন কত উদাহরণ রয়েছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুনিয়ায়।

কিন্তু এই দলের সঙ্গে তো জড়িয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়! ধুর, কে রাহুল দ্রাবিড়! ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে মালিকরা যা চাইবেন, তাই হবে। তাঁরা যাকে খুশি রাখবেন, যাঁকে খুশি ছেঁটে ফেলবেন। কোচের কথার মূল্য কতটুকু! কোচের পরামর্শকে কে পাল্লা দেয়!

কিন্তু আসল ঘটনা একটু অন্যরকম। তের বছরের এই কিশোরকে নেওয়ার পরামর্শটা নাকি একদা ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’ নামে পরিচিত রাহুল দ্রাবিড়েরই। নিলামে যত দরই উঠুক, রাজস্থান রয়্যালস যে এই ছেলটির জন্য অলআউট ঝাঁপাবে, এটা নাকি রাহুল দ্রাবিড়ই পইপই করে বলে দিয়েছিলেন।

ছেলেটি কে, এটা বোঝাতে দেড় বছর পর আর কোনও ক্লু দেওয়ার দরকার নেই। বৈভব সূর্যবংশী নামটার সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল আজ পরিচিত। শুধু ভারত কেন, তামাম ক্রিকেট বিশ্বেই ছড়িয়ে গেছে নামটা। জিওফ্রে বয়কট থেকে ভিভ রিচার্ডস, ইয়ান বথাম থেকে অ্যালান বর্ডার। এই ছেলের তাণ্ডবের সঙ্গে সবাই অগ্নিবিস্তর পরিচিত। কেউ উচ্ছ্বসিত, কেউ

আশাবাদী, কেউ আরও একটু দেখে নিতে চান, কেউ আবার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ী।

সময়টা ১৯৮৯। ক্রিকেটবিশ্বে এভাবেই আবির্ভাব ঘটেছিল ১৬ বছরের এক বিস্ময় বালকের। ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রাম, আব্দুল কাদিরদের সামলাতে পাকিস্তানগামী বিমানে তুলে দেওয়া হয়েছিল শচীন তেডুলকার নামের এক কিশোরকে। সেই ষোল বছরেই কী অবলীলায় ইমরান বা আক্রামকে পুল মেরে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আব্দুল কাদিরকে স্টেপ আউট করে পরপর তিন বলে ছক্কা হাঁকাচ্ছিলেন। ওয়াকার ইউনিসের বাউন্ডারে মুখ রক্তাক্ত হওয়ার পরেও কী অসীম সাহসে বুক চিতিয়ে ব্যাট করছিলেন। ক্রিকেট বিশ্ব মুগ্ধ না হয়ে পারে! সেই ছোট্ট চারাগাছ ২৪ বছরের ক্রিকেটজীবনে কী প্রকাণ্ড এক মহীরুহ হয়ে উঠেছিলেন, ক্রিকেট দুনিয়া জানে।

বিহারের একেবারে প্রান্তিক এলাকা থেকে উঠে আসা এক কিশোর যদি হঠাৎ করে কোটিপতি হয়ে যায়, মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা। এক কোটি লিখতে গেলে একের পিছনে কটা শূন্য বসাতে হয়, সেটাও এই কিশোর ঠিকঠাক জানে না। দরকার ছিল আগলে রাখা, সামলে রাখা। আড়াল থেকে সেই কঠিন কাজটাই সেদিন করেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। জানতেন, শুরু থেকেই তাকে নামিয়ে দিলে বিপদ হতে পারে। কয়েকটা ম্যাচে ব্যর্থ হলে মনোবল ভেঙে যেতে পারে, ক্রিকেটজীবনই শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই এই মোক্ষম অজুটায় গোপনে শান দিয়ে



গেছেন। দলের পরিবেশের সঙ্গে, সাজঘরের সঙ্গে, ভরে ওঠা গ্যালারির সঙ্গে, গ্ল্যামারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময় দিয়েছেন। নামালেন আইপিএলের একেবারে বিদায়বেলায়। প্রথম ম্যাচে সামনে লখনউ। কী আচর্য। প্রথম বলেই কিনা ছেলে ছক্কা হাঁকিয়ে বসল! দিনটা ছিল ১৯ এপ্রিল। এই তারিখের কথা উঠে এলে ঋতুপর্ণ ঘোষের সেই জাতীয় পুরস্কার পাওয়া ছবিটার কথা মনে পড়ে। কিন্তু এই দিনটা একইসঙ্গে আইপিএলের দুনিয়ায় বৈভবের পথ চলার দিন।

একটা বিস্ময় যেন আরেকটা বিস্ময়কে ছাপিয়ে

যায়। আসল চমকটা তোলা ছিল ২৮ এপ্রিলের জন্য। সেদিন ১৪ বছরের কিশোরের ব্যাটে সত্যিই তাণ্ডব দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। ছেলে কিনা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বসল! যেমন তেমন সেঞ্চুরি নয়, একলহমায় একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দেওয়া সেঞ্চুরি। ১) আইপিএলের ইতিহাসে সবথেকে কম বয়সে সেঞ্চুরি, ২) ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি (মাত্র ৩৫ বলে), ৩) একটি ইনিংসে ভারতীয় হিসেবে সবথেকে বেশি ছক্কা (১১টি)। আরও কত খুচরো রেকর্ড যে সেদিন হয়েছিল, তার হিসেব করা মুশকিল।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, বৈভব কি তার আগে কিছুই করেনি! তার আগেই তার রনজি ট্রফিতে অভিষেক হয়ে গেছে। এমনকী ভারতের অনূর্ধ্ব দলেও খেলে ফেলেছে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, এই বিস্ময় বালককে আসমুদ্র হিমাচল চিনল আইপিএলের সুবাদেই। গতবারের আইপিএলে যে স্বপ্নের উড়ানের শুরু, তা চষে বেড়াচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটের মহাকাশে। অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে তিন ঘরানাতেই নিজের দাপট দেখিয়েছে। যখন যে দেশে গেছে, সেই দেশের মিডিয়া আকুল হয়েছে তাকে ঘিরে। একবছর আগে থেকেই দাবি উঠে গেছে, বৈভবকে

জাতীয় দলের আউনিয় এবার আনা হোক। কিন্তু আইসিসির নিয়মে পনের বছর বয়স না হলে সিনিয়র আন্তর্জাতিক দলে নেওয়া যায় না। এবার আইপিএল গুরু ঠিক আগেই সেই পনেরোর গন্ডি পেরিয়ে গেল সমস্তপুরের এই কিশোর।

কিন্তু এবারের আইপিএলেও সেই বাড় দেখা যাবে তো! নাছোড়বান্দা প্রত্যাশা যেমন ছিল, তেমনই সংশয়ের চোরাশ্রোতও ছিল। প্রথম চার ম্যাচেই তার রান দুশো। এর মধ্যে যশপ্রীত বুমরার প্রথম বলে ছক্কাও আছে। এক বল যেতে না যেতেই ফের ছক্কা। যে বুমরাকে টুপি খুলে কুর্নিশ জানায় ক্রিকেট বিশ্ব, তাঁর বোলিংয়ে এমন বেপরোয়া ছক্কা! মনে পড়ে যায় সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়া, ‘বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!’ ঠিক তিনদিন পরেই গুয়াহাটিতে বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থানের লড়াই। মিডিয়া সবসময় বাইনারি খোঁজে। এর সঙ্গে ওকে লড়িয়ে দিতে পারলেই যত আনন্দ! বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান ম্যাচ মিডিয়ার ভাষায় হয়ে উঠল বিরাট কোহলি বনাম বৈভব সূর্যবংশীর ম্যাচ। একদিকে বিরাট কোহলি ১৯ বছর ধরে আইপিএলে খেলছেন। আর এদিকে বৈভবের বয়সই সবে ১৫। কোনও তুলনা হয়! বিরাট বা বৈভব, দুজনের কাছেই এই তুলনা নিশ্চিতভাবেই বিড়ম্বনার। কিন্তু শুনছেটা কে? মশলা চাই। মশলা ক্রিকেটে আরও বেশি করে মশলা চাই। সেদিন বেঙ্গালুরুকে কার্যত তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিল রাজস্থান। সৌজন্যে সেই বৈভব। বিরাটের ব্যাট থেকে এসেছিল ৩২। সেখানে বৈভবের ব্যাটে মাত্র ২৬ বলে ৭৮। বিরাট যখন ছক্কাহীন,

তখন বৈভবের ব্যাটে সাত ছক্কা। পনেরোর ঝড়ের কাছে সেদিন সত্যিই যেন ম্লান মনে হয়েছিল মহাতারকা বিরাটকেও। আর আইপিএল শেষে কী দেখা গেল? রাজস্থান ট্রফি জয়ের দৌড়ে নেই ঠিকই, কিন্তু সর্বাধিক রানের অরেঞ্জ ক্যাপ কিন্তু উঠে এল এই পনেরোর কিশোরের মাথাতেই। তাঁর রান ৭৭৬। দুইয়ে শুভমান গিল, তিনে সাই সুদর্শন। বিরাট কোহলি রয়েছেন অন্তত একশো রান পিছনে। গাভাসকারের ব্যাটন উঠে এসেছিল শতাব্দের হাতে। শতাব্দের ব্যাটন এসেছিল বিরাটের হাতে। অন্তত আইপিএলের পর বলাই যায়, বিরাটের ব্যাটন উঠে এসেছিল বৈভবের হাতে।

অপেক্ষা বাড়ছিল, জাতীয় দলের জার্সিতে কখন হবে অভিষেক? দলে নিয়েও শুরুতে বসিয়ে রাখা হল। যদিও সুযোগ এল জিম্বাবোয়ে সফরে। সবচেয়ে কম বয়সে অভিষেকের নজির হল ঠিকই, সবচেয়ে কম বয়সে অর্ধশতাব্দের রেকর্ডও মুকুটে এসে গেল। কিন্তু ওপেনিং স্লটে অভিষেক শর্মা আর সঞ্জু স্যামসন। এই জুটিকে এখনই ভাঙতে চাইছেন না কোচ গৌতম গম্ভীর। টুকটাক সুযোগ আসছে। কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন অপেক্ষাই করতে হবে।

কিন্তু এই ‘অপেক্ষা’ তাকে আরও পরিণত করছে? নাকি আরও হতাশ করে তুলছে? আপাতত রিজার্ভ বেঞ্চে বসে অন্যের ব্যর্থতা কামনা করতে হচ্ছে। পনেরোর কিশোরকে যদি এমন ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকতে হয়, সেটাও কাম্য নয়। এমন বিস্ময়কে লম্বা ওয়েটিংয়ে রাখার সত্যিই কি কোনও যুক্তি আছে?

বৈশাখ টাইমস



bengaltimes.in



ISSN: 2445 5657

